দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৭০ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা।। ২৫ ডিসেম্বর ২০১৭।। ৯ পৌষ - ১৪২৪।। যুগাব্দ ৫১১৯।। website : www.eswastika.com ।।

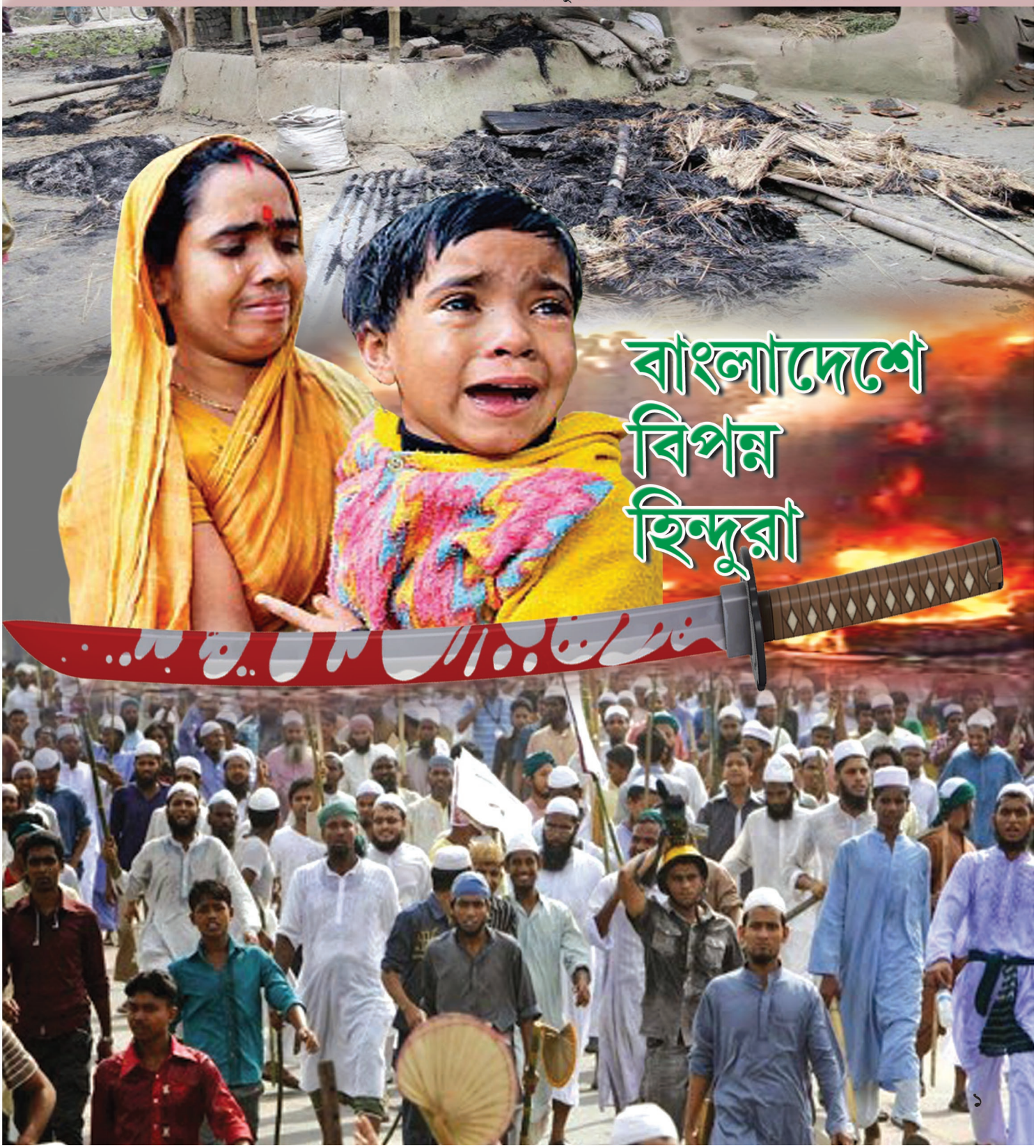

বাংলাদেশে বিপন্ন হিন্দুরা

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ১৮ সংখ্যা, ৯ পৌষ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

২৫ ডিসেম্বর - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ / ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

গুজরাট-হিমাচল প্রদেশে বিজেপির জয় মমতাকে বিপন্ন করেছে ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

খোলা চিঠি : গতি নয়, গান্ধী বদল ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

আফরাজুলের হত্যাকাণ্ড এবং মিডিয়ার আস্তিন গুটানো দাদাগিরি ▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ১২

বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম : দুঃসংবাদের অবিরল ধারা ▯ গৌতম কুমার মণ্ডল ▯ ১৪

ধর্ম সংস্কৃতির চেতনার অভাবে হিন্দু কন্যারা লভ জিহাদের শিকার ▯ প্রীতীশ তালুকদার ▯ ১৬

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন প্যান ইসলামিক জিহাদের অংশ ▯ ১৯

পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা জাগ্রত হলেই বাংলাদেশের হিন্দুরা বাঁচবে ▯ মোহিত রায় ▯ ২২

একাত্তরের বাংলাদেশ : নরকের নগ্নরূপ ▯ হিরণ্ময় কার্লেকর ▯ ২৭

সূর্য পুজোরই অন্য নাম ইতু ▯ নন্দলাল ভট্টাচার্য ▯ ৩১

অবলুপ্তির পথে শিবাশ্রু হ্রদ কটাস ▯ অমিত ঘোষ দস্তিদার ▯ ৩৩

পৌষমাসের কৃষিকর্ম ▯ কল্যাণ চক্রবর্তী ▯ ৩৫

নিয়মিত বিভাগ

এই সময়, সমাবেশ সমাচার : ২৪-২৬ ▯ চিঠিপত্র : ২৯-৩০ ▯ অঙ্গনা : ৩৪ ▯ স্বজন বিয়োগ : ৩৭ ▯ অন্যরকম : ৩৮ ▯ খেলা : ৩৯ ▯ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ▯ চিত্রকথা : ৪২

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

গুজরাট হিমাচলে নিরঙ্কুশ বিজেপি

প্রতিটি এক্সিট পোলে বিজেপি এগিয়ে ছিল। ফলাফলেও দেখা গেল তাই। গুজরাট এবং হিমাচলে জয়ী হয়েছে বিজেপিই। কংগ্রেসের জাতপাতের রাজনীতি, লোভ দেখিয়ে ভোট কেনার চেষ্টা, মিডিয়ার লজ্জাহীন অপপ্রচার— সব কিছু তুচ্ছ করে বিজেপি সরকার গড়েছে গুজরাট এবং হিমাচলে। গুজরাটে বিজেপির আসন কমেছে, কিন্তু ভোট বেড়েছে। সব থেকে বড় কথা, এত বছর ক্ষমতায় থাকার পরেও সাধারণ মানুষ আস্থা রেখেছেন বিজেপির ওপর। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে হিমাচল এবং গুজরাটের নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক দুটি রচনা। ফাঁস হবে অনেক ভেতরের খবর। লিখবেন রন্তিদেব সেনগুপ্ত, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিমন্যু গুহ।

।। দাম একই থাকছে : দশ টাকা।।

হকার বন্ধুদের
কাছে অনুরোধ
স্বস্তিকার জন্য
নীচের ঠিকানায়
যোগাযোগ করুন—

বিশাল বুক সেন্টার

৪, টটি লেন
কলকাতা-৭০০০১৬

ফোন ঃ
(০৩৩) ৪০৬৪৪১০৩
৪০৬৪৪০৯৭

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

উন্নয়ন ও সুশাসনের জয়

বুথ ফেরত সমীক্ষার গ্রহণযোগ্যতা লইয়া যাঁহারা প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন তাঁহারা দেখিলেন মোদীর 'হুচ গুজরাট' অর্থাৎ 'ভাইব্র্যান্ট গুজরাটেরই' জয় হইয়াছে। গুজরাট ও হিমাচল প্রদেশের ভোটের ফলাফলই প্রমাণ করিতেছে দেশবাসী বিকাশের পক্ষেই রহিয়াছেন। জাতপাতের সঙ্কীর্ণ রাজনীতির কারণে বিজেপির কিছু আসন কম হওয়ায় যাহারা গুজরাট মডেল ধাক্কা খাইল অথবা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আত্মবিশ্বাস দুই-এক ইঞ্চি কমিয়া যাইল বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন তাঁহারা চিরকালই বিকাশের বিপক্ষে থাকিয়াছেন। প্রথমাবধিই তাঁহারা মোদীর জনপ্রিয়তাকে ছোট করিয়া দেখিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী গুজরাটে ভারতীয় জনতা পার্টির জয়কে পরাজয় বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি এই জয়কে সহ্য করিতে পারিতেছেন না। তিনি ভীত হইয়া পড়িয়াছেন যে ইহার পরেই বিজেপির টার্গেট হইবে বাংলা। পশ্চিমবাংলায় যেভাবে জাতপাতের রাজনীতি, তুষ্টীকরণের রাজনীতি তিনি শুরু করিয়াছেন তাহাতে বাংলার মানুষ তাঁহার বিপক্ষে যাইতেছেন। তাই গুজরাটে বিজেপির জয়ে তাঁহার গাত্রদাহ। তাঁহার অজানা নহে, কংগ্রেস ২৬টি রাজ্যের মধ্যে ১৫টি-তে শাসনক্ষমতা কায়েম করিয়াছিল আর মানুষের আশীর্বাদে বিজেপি ইতিমধ্যেই ২৯টি রাজ্যের মধ্যে ১৯টি-তে ক্ষমতায় আসীন হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার শিয়রে শমন।

কংগ্রেস প্রথম হইতেই জাতপাত, বংশ, সম্প্রদায় লইয়া ভোটের বৈতরণী পার হইয়াছে। শতাব্দী প্রাচীন দলটি এই ধারাকেই ধরিয়া রাখিয়াছে। গুজরাট নির্বাচনে ইহাকে নগ্নরূপে কংগ্রেস প্রকাশ করিয়াছে। ভোট বিশ্লেষকরা ইহার ভিত্তিতেই সমীক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে পরিবারতন্ত্র ও জাতপাতের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনতা পার্টির জয় হইয়াছে। কংগ্রেস শুধু বিজেপির বিকাশের বিরোধিতা করে নাই, ভ্রান্ত প্রচারের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছে গুজরাটে কোনো বিকাশ হয় নাই। ভয়ানক কলুষিত প্রচার সত্ত্বেও গুজরাটবাসী বিকাশের পক্ষেই রায় দিয়াছেন। বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ তাই বলিয়াছেন, গুজরাট ও হিমাচল প্রদেশের এই জয় জাতপাতের রাজনীতির বিরুদ্ধে জয়, তোষণের রাজনীতির বিরুদ্ধে জয় এবং পরিবারতন্ত্রের রাজনীতির বিরুদ্ধে জয়। এবং জয় হইয়াছে উন্নয়ন ও সুশাসনের রাজনীতির। বস্তুত গুজরাটে জাতপাতের রাজনীতি ও মুসলমানরাই কংগ্রেসের আসন বাড়াইয়াছে, এমনটাই বলিতেছেন গুজরাটবাসী।

পাতিদার নেতা হার্দিক প্যাটেল জানিতেন গুজরাটবাসী জাতপাতের রাজনীতিতে প্রভাবিত হইবেন না, তাই তিনি ফল প্রকাশের একদিন আগেই অভিযোগ করিয়া বসিয়াছিলেন যে, বিজেপি প্রশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার দিয়া ইভিএমে কারচুপি করিয়াছে। হারিয়া যাইবার পরও তিনি একই কথা বলিতেছেন। বিজেপি বিরোধীরা ভোটে হারিলেই ইভিএম কারচুপির অভিযোগ তোলেন আর জিতিলে চুপটি করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন গুজরাটে এইবার মহাপরিবর্তন আসিবে। ফল প্রকাশের পর দেখা যাইল উন্নয়ন ও সুশাসনের অভিঘাতে তাহাদের মহাপরিবর্তনের ফানুস ফাটিয়া গিয়াছে। গুজরাটবাসী দেখাইয়া দিয়াছেন মোদী হাওয়া ছাড়াও উন্নয়ন ও সুশাসনের হাওয়ায় বিজেপি জিতিতে পারে।

এতদ্‌সত্ত্বেও গুজরাটের শাসকদলের আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন রহিয়াছে। জিএসটি লইয়া ব্যবসায়ী সমাজের অসন্তোষ দূর করা, গ্রামীণ ও বনবাসী এলাকায় আশা-আকাঙ্ক্ষার ভাগীদার হওয়া এবং যুবসমাজের মনের খবর লইবার মানসিকতা থাকা প্রয়োজন। বিজেপির গুজরাট নেতৃত্বকে বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে হইবে—রাজ্যবাসী যেন কোনো প্রকারেই নরেন্দ্র মোদীর অভাব বোধ না করেন।

সুভাষিতম্

অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ দ্বয়ং দেহপ্রাতিষ্ঠিতম্।

মোহাদাপদ্যতে মৃত্যুঃ সত্যেনাপদ্যতেঽমৃতম্।। (শঙ্করাচার্য)

অমরত্ব ও মৃত্যু দুই-ই এক দেহে অবস্থান করে। মোহের পিছনে ছোটার ফলে মৃত্যু আসে এবং সত্যের সন্ধানে চলার কারণে অমরত্ব লাভ হয়।

বাইশ বছর পরেও গুজরাট বিজেপির হিমাচলে কংগ্রেস পাঁচ বছরেই ধরাশায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গুজরাট আবার বিজেপির! হিমাচল প্রদেশেও কংগ্রেসকে পর্যুদস্ত করে ক্ষমতায় এসেছে তারা। গুজরাটে একটানা বাইশ বছর ক্ষমতায় থাকার ফলে প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতার যাবতীয় সম্ভাবনায় জল ঢেলে মানুষের মন জিততে সমর্থ হয়েছে বিজেপি। প্রমাণ করেছে

সুশাসন এবং উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকলে মানুষ প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতার কথা ভাবেন না। গুজরাটে জয়ের আনন্দ বহুগুণ বেড়ে গেছে হিমাচলের জয়ে। ২০১৭-র ডিসেম্বর দেশের জাতীয়তাবাদী শক্তির কাছে নিঃসন্দেহে অনেকদিন পর্যন্ত স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হবার পর এই প্রথম গুজরাটে বিধানসভা নির্বাচন হলো। স্বভাবতই এই মেগাইভেন্ট নিয়ে মানুষের উৎসাহ ছিল তুঙ্গে। মিডিয়া কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীকে মোদীর বিরুদ্ধে গ্ল্যাডিয়েটর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লাগাতার চেষ্টা করে গেছে। এমনকী প্রধানমন্ত্রী-সহ বিজেপির শীর্ষনেতাদের অপমান করতেও ছাড়েনি। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ইভিএমের মাধ্যমে মানুষ তার জবাব দিয়েছেন। গুজরাট অস্মিতার জনক এবং ভাইব্র্যান্ট গুজরাটের স্রষ্টা নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীকে তারা নিরাশ করেননি।

হ্যাঁ, গুজরাটে বিজেপির আসন সামান্য কমেছে। বিজেপি পেয়েছে ৯৯টি আসন। কংগ্রেস পেয়েছে ৮০টি। এই তথ্য থেকে যারা ভাবছেন ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি নির্ঘাৎ হারবে এবং নরেন্দ্র মোদীর আসন টলে যাবে, তাদের জেনে রাখা ভালো বিজেপির ভোট বেড়ে হয়েছে ৪৯.৩ শতাংশ। কংগ্রেস পেয়েছে ৪২.৪ শতাংশ ভোট। রাজ্যের প্রায় অর্ধেক মানুষ যে দলকে ভোট দেয় তাদের গ্রহণযোগ্যতা, জনপ্রিয়তা, শক্তি এবং সম্ভাবনা নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলা যায় না। যতই তারা আসন কিছু কম পাক।

ভোট-বিশেষজ্ঞদের একাংশ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট নিয়েও। কংগ্রেস পেয়েছে ৪২.৪ শতাংশ ভোট। তাদের প্রশ্ন, এর মধ্যে কংগ্রেসের নিজস্ব ভোট কত শতাংশ? হার্দিক প্যাটেল, জিগনেশ মেভানি এবং অল্পেশ ঠাকোরের সঙ্গে জোট না বাঁধলে কি কংগ্রেস এত ভোট পেত? গুজরাটের স্থানীয় নেতাদের ২০ শতাংশ ভোট বাদ দিলে কংগ্রেসের ভাগে থাকে ২২.৪ শতাংশ ভোট। এই ভোট পেলে কংগ্রেসের আগমার্কা নেতারা অনেকেই হারতেন। জাতপাতের ধুয়ো তুলে মানুষকে বিভ্রান্ত করে তাৎক্ষণিকভাবে লাভ হলেও বৃহত্তর ক্ষেত্রে কোনও লাভ হয় না। গুজরাটের অনেক জায়গাতেই তা হয়নি। উত্তর গুজরাটে বরাবরই কংগ্রেস শক্তিশালী। অথচ এবার ১৭টি আসনের মধ্যে ১৪টি পেয়েছে বিজেপি, ৩টি কংগ্রেস। মধ্য গুজরাটে ২০১২-র ফল অবিকৃত রেখে বিজেপি পেয়েছে ৩৭টি আসন। কংগ্রেস ২২টি। দক্ষিণ গুজরাটে ৫৪ শতাংশ ভোট পেয়ে বিজেপি দখল করেছে ২৫টি আসন। কংগ্রেস পেয়েছে ৩৬.৪ শতাংশ ভোট। আসন ৮টি। এই ফল থেকে স্পষ্ট, বিভাজনের রাজনীতি উসকে দেওয়া ছাড়া রাহুল গান্ধীর আর কোনও কৃতিত্ব নেই। এমনটাই মনে করছেন কয়েকজন ভোট-বিশেষজ্ঞ।

হিমাচলে বিজেপি আকাশছোঁয়া সাফল্য পেয়েছে বললে বাড়িয়ে বলা হয় না। মোট ৬৮টি আসনের মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ৪৪টি। কংগ্রেস ২১টি। অন্যান্য ৩টি। হিমাচলে ২০১২-র বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি পেয়েছিল ৩৮.৫ শতাংশ ভোট। এবার সেটা বেড়ে হয়েছে ৪৮.৮ শতাংশ। ২০১২-তে কংগ্রেস পেয়েছিল ৪২.৮ শতাংশ ভোট, এবার ৪১.৭ শতাংশ। নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতার প্রভাব পড়েছে কংগ্রেসের ফলাফলে। গুজরাটে বিজেপির ক্ষেত্রে যা হয়নি।

দুই রাজ্যে দলের ফলাফলে স্পষ্টতই খুশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গুজরাট ও হিমাচলের মানুষের কাছে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। আলাদা করে অভিনন্দন জানিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহকে। এই মুহূর্তে দেশের ২৯টি রাজ্যের ১৯টি-তে বিজেপি অথবা এনডিএ সরকার। ১৯৯৩ সালে দেশের ২৬টি রাজ্যের মধ্যে ১৫টি-তে কংগ্রেস সরকার ছিল। গুজরাট ও হিমাচল প্রদেশে জিতে কংগ্রেসের সেই রেকর্ড বিজেপি ভেঙে দিয়েছে। বাকি শুধু পশ্চিমবঙ্গের ৩৪ বছরের বাম শাসনের রেকর্ড। ২০২২ সালে জিতে সেই রেকর্ডও ভাঙতে পারবেন বলে মনে করছেন বিজেপির অনেক নেতা।

দক্ষিণ এশিয়ায় পরমাণু যুদ্ধের জিগির পাকিস্তানের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গুজরাটের নির্বাচনী ফল ঘোষণার অপেক্ষা। দক্ষিণ-এশিয়ায় ফের পরমাণু যুদ্ধের জিগির তুলল পাকিস্তান। ইসলামাবাদে গত ১৯ ডিসেম্বর পাকিস্তানের জাতীয় নিরাপত্তা-সংক্রান্ত এক আলোচনা চক্রে সেদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল নাসের খান জানজুয়া দক্ষিণ এশিয়ায় নিউক্লিয়ার যুদ্ধের সম্ভাবনা নিয়ে উস্কানিমূলক মন্তব্য করেন। তাঁর তির ভারত ও আমেরিকার দিকে। তাঁর বক্তব্য ভারতের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমেরিকা কোটি-কোটি টাকার চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোরের কাজ আটকে দিতে চাইছে। তাঁর আরও অভিযোগ যে ভারত নাকি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করছে যা পাকিস্তানকে যুদ্ধে যেতে প্ররোচিত করছে। যদিও কূটনীতিকরা মনে করেন ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে পাকিস্তানকে 'প্ররোচিত' করতে হয় না। এটা তাদের 'স্বতঃস্ফূর্ত' ভাবেই আসে। নাসেরের আরও অভিযোগ দক্ষিণ এশিয়ার নানা বিষয়ে আমেরিকা নাক গলানোয় সন্ত্রাস বেড়েছে পাকিস্তানে। আফগানিস্তানে তালিবানিদের বাড়-বাড়ন্তের জন্য আমেরিকার পাকিস্তানকে দায়ী করা নিয়েও উস্মা প্রকাশ করেন তিনি। দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের প্রভাব আটকাতেই চীন-পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে বলে মনে করেন পাকিস্তানের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা। আমেরিকা কেন ইসলামাবাদের পরিবর্তে নয়া দিল্লিকে বেশি দূরত্ব দেবে তা নিয়েও ক্ষোভ রয়েছে নাসেরের। কূটনীতিকরা মনে করেন চীন-পাকিস্তান ইকোনমিক করিডোর প্রকল্পটি আসলে ভারত-বিরোধী চক্রান্ত ব্যতীত আর কিছু নয়। এই করিডোর পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের মধ্যে দিয়ে যাবে। যা চীনের জিনজিয়াং প্রদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের বালুচিস্তানকে সংযুক্ত করবে। এর ফলে একদিকে যেমন ভারতের ঘাড়ে তার শত্রু দুই দেশ চীন- পাকিস্তান নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পাবে, অন্যদিকে চীন-পাকিস্তান সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুখ খোলায় সংশ্লিষ্ট দুই প্রদেশের মানুষের ওপর অত্যাচারের মাত্রাও বাড়ানো যাবে। এর পরিপ্রেক্ষিতেই নিউক্লিয়ার যুদ্ধের হুমকি দিয়ে ভারত-আমেরিকাকে সমঝে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পুনর্বাসন নিয়ে কেন্দ্রের ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের স্বাধীনতা সংগ্রামী ও পুনর্বাসন দপ্তরের কাজকর্ম সম্প্রতি পর্যালোচনা করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ। স্বারাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হংসরাজ গঙ্গারাম আহির, স্বরাষ্ট্র সচিব রাজীব গৌবা এবং মন্ত্রকের পদস্থ আধিকারিকরা যোগ দেন এই পর্যালোচনা বৈঠকে। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পেনশন, পুনর্বাসন প্রকল্প এবং শত্রু সম্পত্তি সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়েও বৈঠকে পর্যালোচনা করেন রাজনাথ সিংহ। শত্রু সম্পত্তি আইন, ২০১৭-র নতুন সংস্থানগুলির গুরুত্ব বিবেচনার জন্য নির্দেশ দেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। এই আইনটি সম্প্রতি সংশোধিত আকারে চালু করা হয়েছে। বৈঠকে স্থির হয় যে, স্বতন্ত্রতা সৈনিক সম্মান যোজনার আওতায় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্বাধীনতা যোদ্ধাদের কাছে পেনশন পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টিকে আরও সংহত করে তোলা হবে। এই লক্ষ্যে আরও শক্তিশালী করে তোলা হবে পেনশন বন্টন সম্পর্কিত নজরদারি সেলটিকে (পিডিএমসি)। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে অবহিত করা হয় যে, ৭৩ শতাংশ পেনশন অ্যাকাউন্টের সঙ্গেই এখন আধার যোগ করা হয়েছে।

রেলের পরিচ্ছন্নতা বাড়ানোর লক্ষ্যে পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতীয় রেল স্টেশন, ট্রেন ও ইয়ার্ড-সহ অন্যান্য স্থানের পরিচ্ছন্নতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে বিশেষ কয়েকটি হলো—

(১) প্রধান প্রধান স্টেশনগুলিতে যন্ত্রের সাহায্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ করা হচ্ছে।

(২) আঞ্চলিক স্তরে বিভিন্ন স্টেশনে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।

(৩) রেল চত্বরে নোংরা করলে জরিমানা সংক্রান্ত ২০১২ সালের নিয়মবিধি আরো বেশি কঠোর করা হয়েছে।

(৪) প্রধান প্রধান স্টেশনগুলিতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে নজরদারির জন্য সিসিটিভির ব্যবহার বাড়ানো হয়েছে।

(৫) ডিপোতে ট্রেনের কামরা আরো ভালোভাবে পরিষ্কার করার জন্য যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ দূরপাল্লার ট্রেনগুলিতে অন বোর্ড হাউজকিপিং সার্ভিস পরিষেবা ও 'ক্লিন মাই কোচ' এবং ক্লিন ট্রেন স্টেশন (সিটিএস) প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এর ফলে পরিচ্ছন্নতার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে।

ট্রেন ও স্টেশনে পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য নিউ স্ট্যান্ডার্ড বিড ডকুমেন্ট জারি করা হয়েছে। এর ফলে পরিচ্ছন্নতার রক্ষণাবেক্ষণ আরও কার্যকর হবে বলে মনে করা হচ্ছে। রাজ্যসভায় সম্প্রতি রেলপ্রতিমন্ত্রী রাজেন গোঁহাই এক লিখিত প্রশ্নের জবাবে এই খবর দেন।

বিদেশিদের করা অপরাধে পশ্চিমবঙ্গ তালিকার শীর্ষে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এন সি আর বি-এর প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ২০১৬ সালে দেশের অন্যতম ট্যুরিস্ট-প্রিয় রাজ্য গোয়া নয় এমনকী রাজধানী শহর যেখানে সারা বিশ্বের মানুষের যাওয়া আসা চলে তাদের পেছনে ফেলে বিদেশিদের অপরাধ সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম স্থানে উঠে এসেছে পশ্চিমবঙ্গ। ২০১৬ সালে ৫২০ জন বিদেশি পশ্চিমবঙ্গের বুকে ফৌজদারি অপরাধে জড়িয়ে পড়েছেন। এই সংখ্যাটি তালিকার দ্বিতীয় স্থানে থাকা দিল্লির তুলনায় সাড়ে তিন গুণ বেশি। এ প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা জানিয়েছেন যে প্রতিবেশী বাংলাদেশের সঙ্গে দীর্ঘ কাঁটাতারহীন অসুরক্ষিত সীমান্ত থাকার কারণেই ভিনদেশি অপরাধীরা এদেশে অপরাধ সংঘটিত করছে। গত ৭ই ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ অন্যান্য

সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে এ সংক্রান্ত এক আলোচনায় সীমান্তে নজরদারি বাড়ানোর ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর জোর দেন যাতে সীমান্তের ফাঁক-ফোকরগুলির ওপর আরও কড়া নজর রাখা যায়। বিশ্লেষণ অনুযায়ী ৫২০টি অপরাধ থেকে ৬৪ শতাংশ অর্থাৎ ৩৩২ জন বাংলাদেশি অপরাধীকে যদি সরিয়ে নেওয়া যায় তাহলেও পড়ে থাকা ১৯৮ জন যে আলাদা জাতির বিদেশি অপরাধী পড়ে থাকে তাদের সংখ্যাও দিল্লির ১৪৩ জন অপরাধীর সংখ্যাকে ছাপিয়ে যাবে। এন সি আর বি-এর দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী দিল্লির পরেই ৯১টি নিয়ে কর্ণাটক, ৮০টি নিয়ে গোয়া ও ৬৪টি অপরাধ নিয়ে তামিলনাড়ু বিদেশিকৃত অপরাধের ক্ষেত্রে পঞ্চম স্থান দখল করেছে। এর মধ্যে মন্দের ভাল ২০১৪ সালে ৬৮৯, ২০১৬-তে ৫৯৭-এর সংখ্যার থেকে ২০১৬-তে অপরাধ ৫২০টি অর্থে নিম্নগামী হলেও সারা দেশের তুলনায় তা আশঙ্কাজনকভাবে বেশি। উল্লেখিত পরিসংখ্যানগুলি কিন্তু গত বছর এপ্রিল মাসে ঢাকা থেকে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে পাঠানো অপরাধ সংক্রান্ত তথ্যের সঙ্গে মিলে যায়। ঠিক ওই সময় নাগাদই বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে হঠাৎ বিদেশি অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

তিন তালাক সংক্রান্ত বিলে মন্ত্রীসভার অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ তিন তালাক নিয়ে তাদের অবস্থান সম্প্রতি স্পষ্ট করেছে মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক। মন্ত্রী শ্রীমতী মেনকা সঞ্জয় গান্ধী ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে তিন তালাক বিষয়ে বিচার-বিবেচনা করার জন্য একটি মন্ত্রীগোষ্ঠী গঠনের অনুরোধ জানান। এই মন্ত্রক সুপ্রিম কোর্টে তিন তালাক কেসের অন্যতম উত্তরদাতা। তাৎক্ষণিক তালাককে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য করার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার প্রস্তাবকে রূপ দেবার ক্ষেত্রে এই মন্ত্রকের ভূমিকাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা তাৎক্ষণিক তিন তালাক ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য করে একটি বিল মঞ্জুর করেছে। বিল অনুযায়ী, মুসলমান সম্প্রদায়ের কোনো পুরুষ তাৎক্ষণিকভাবে তিন তালাক দিলে তার তিন বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। মৌখিকভাবে বা লিখে বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে তিন তালাক প্রদানের প্রথাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং একে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে। বিলে, নির্যাতিতা মুসলমান মহিলা ও তার ওপর নির্ভর সন্তানের জন্য আর্থিক সাহায্যের সংস্থান রয়েছে। ওই মহিলা তাঁর নাবালক শিশুর জন্যও আইনি অধিকার পাবেন বলেও বিলে উল্লেখ করা হয়েছে। মন্ত্রক মুসলমান সমাজের মহিলাদের সামাজিক ও আইনগত ক্ষমতায়নের জন্য অবিরাম কাজ করে চলেছে এবং তাদের সহায়তায় সর্বদা দৃঢ় পদক্ষেপ নিচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name : United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

ডোকলাম : যে-কোনও পরিস্থিতির জন্য সেনা প্রস্তুত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ডোকলাম সীমান্তে প্রতিপক্ষের দিক থেকে যে আঘাতই আসুক না কেন তার সমুচিত জবাব দেবার জন্য ভারতীয় সেনা তৈরি। একথা বলেছেন ইস্টার্ন কম্যান্ডের কম্যান্ডিং ইন চিফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল অভয় কৃষ্ণ। বিজয় দিবস উপলক্ষে কলকাতায় আয়োজিত একটি সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, যে-কোনও পরিস্থিতির জন্য তৈরি হয়ে রয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারত ভুটান এবং চীনের ত্রিদেশীয় সীমান্তে সামরিক উদ্দেশ্যে নির্মীয়মাণ একটি রাস্তাকে কেন্দ্র করে ভাত ও চীন বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। চীন যাতে রাস্তা তৈরি করতে না পারে তার জন্য ভারতীয় সেনা প্রায় দু'মাস ধরে সীমান্তে মোতায়েন ছিল। কারণ রাস্তাটি তৈরি হলে ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারত।

সাংবাদিক সম্মেলনে চীনের নাম না করে অভয় কৃষ্ণ জানান ভারতীয় সেনা উদ্দীপনার একেবারে তুঙ্গে রয়েছে। তিনি বলেন, 'আমরা তৈরি। ওদের যা করার করতে দিন, আমরাও এমন জবাব দেব যা ওরা অনেকদিন মনে রাখবে।' তিনি আরও বলেন, 'ভারতীয় সেনা উৎসাহ উদ্দীপনার তুঙ্গে রয়েছে। আমরা যে-কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য আমরা যা প্রয়োজন সবই করব।' ভারত কি এখনই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'অবশ্যই আমরা প্রস্তুত।'

উবাচ

"পাকিস্তান, বাংলাদেশের চেয়ে ভারতে যথেষ্ট ভালো অবস্থায় রয়েছেন সংখ্যালঘুরা।"

ইন্দোরে সাহিত্য উৎসবে বক্তৃতা প্রসঙ্গে

তসলিমা নাসরিন
বাংলাদেশি লেখিকা

"হিন্দু সমাজ দুর্বল হলে ভারতবর্ষ দুর্বল হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। সেসব অঞ্চলে হিন্দু সমাজ দুর্বল হয়েছে সেখানেই ভারত থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।"

আগরতলায় হিন্দু সম্মেলনে ভাষণ প্রসঙ্গে

মোহন ভাগবত
সরসঙ্ঘচালক, আর এস এস

"গুজরাট জয়ের দিবাস্বপ্নে বিভোর কংগ্রেসকে হিমাচলের জমিও হারাতে হলো।"

গুজরাট ও হিমাচলে বিজেপির জয় প্রসঙ্গে

নীতীশ কুমার
মুখ্যমন্ত্রী, বিহার

"হিমাচলে আমরা বিরাট জয় পেয়েছি। হিমাচলের ফল দেখিয়ে দিয়েছে, সেখানকার মানুষ নরেন্দ্র মোদীর উন্নয়ন কর্মসূচির অংশীদার হতে চায়।"

হিমাচলে বিজেপির জয় প্রসঙ্গে

অমিত শাহ
বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি

"একবার গুজরাটে ওদের ফেলে দাও---এটাই ছিল বিরোধীদের একমাত্র অ্যাজেন্ডা। কিন্তু এক্সিট পোলের ফল বেরনো শুরু হওয়া মাত্র ওরা বুঝে গিয়েছিল সেটা আর সম্ভব নয়।"

গুজরাটে বিরোধীদের নেতিবাচক রাজনীতি প্রসঙ্গে

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

গুজরাট-হিমাচল প্রদেশে বিজেপির জয় মমতাকে বিপন্ন করেছে

আমাদের চটি পিসির আশা ছিল গুজরাটে এবং হিমাচল প্রদেশের নির্বাচনে বিজেপি হারলেই তিনি দেশজুড়ে 'মোদী হঠাও' আন্দোলনে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপাবেন। হায়! পিসির আশায় ছাই দিয়ে দুটি রাজ্যেই বিজেপি তথা হিন্দুত্বের জয়রথ মসৃণভাবে এগিয়েছে। হিমাচলের জয় নিয়ে তেমন সংশয় ছিল না। কিন্তু গুজরাটে এবার কংগ্রেস জোটের চ্যালেঞ্জকে উড়িয়ে দেওয়া যায়নি। যদিও এই কলমেই এর আগে লিখেছিলাম যে গুজরাটে ফের সরকার গড়ছে বিজেপি। তবে আসন সংখ্যা নিয়ে সংশয় আছে। কারণ, প্রশ্ন ছিল দলিত, পাতিদার এবং ও বিসি ভোট ভাগ হবে কী না। হলে কত শতাংশ ভোট কংগ্রেসের ঝুলিতে যাবে। দেখা গেল ভোট ভাগের অঙ্কের উত্তর মেলেনি। গুজরাটের সাধারণ মানুষ আরও পাঁচ বছর রাজ্য শাসনের দায়িত্ব বিজেপিকেই দিয়েছেন। গুজরাট এবং হিমাচলকে ধরলে এখন দেশের মোট ১৯টি রাজ্যে বিজেপির সরকার চলছে। সামনের বছর আরও কয়েকটি রাজ্যের বিধানসভার ভোট হবে। সেইসব ভোটে সফল হলে ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে নিশ্চিতভাবে মোদী সরকারই ফের ক্ষমতায় আসবে। চটি পিসির ফেডারেল সরকার দুঃস্বপ্ন হয়ে থেকে যাবে। শুধু তাই নয়। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল শিবিরে ভাঙন অনিবার্য হয়ে দেখা দেবে।

বিজেপির সাফল্যে চটি পিসি ভয় পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনের বেশি দেরি নেই। তাই তিনি গ্রামেগঞ্জে দলীয় সভায় মানুষকে বিজেপি জুজুর ভয় দেখাচ্ছেন। বলছেন, 'পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট কিনতে বিজেপি টাকার থলি নিয়ে প্রচারে নামতে পারে। সবাই সতর্ক থাকুন। অপচিত লোকজনদের দেখলে পুলিশকে খবর দিন।' অপরিচিত লোকজন বলতে যে তিনি বিজেপির কর্মীদেরই বোঝাচ্ছেন সে কথাও গোপন করেননি। যেমন, গোপন করেননি জঙ্গলমহলের বেশ কয়েকটি সমবায় সংস্থার ভোটে বিজেপি জয় তাঁকে অবাক করেছে। যদিও বলেছেন, 'বিজেপি টাকা ছড়িয়ে ভোটে জিতেছে। বিজেপিকে বিশ্বাস করবেন না। ওরা চক্রান্তকারী। দাঙ্গাবাজ। ভোট এলেই টাকা নিয়ে ভোট কিনতে নেমে পড়ে। ওদের টাকা পাপের টাকা। ওই টাকা নিলে ঘরের শান্তি নষ্ট হয়।' চটি পিসির প্রলাপ বাকা থেকে স্পষ্ট যে তিনি ভয় পেয়েছেন। কারণ, সিপিএম-

গূঢ় পুরুষের

কলম

কংগ্রেস এখন তাঁরই বি-টিম। পিসির কথায় তাদের নেতারা ওঠে বসে। বশংবদ বিরোধীদের নিয়ে তাই তাঁর চিন্তা নেই। সমস্যা হচ্ছে বিজেপিকে নিয়ে। দেশের ১৯টি রাজ্যে ক্ষমতায় থাকার সুবাদে বিজেপি পুঁচকে একটা আঞ্চলিক দলের তড়পানি সহ্য করবে কেন? পশ্চিমবঙ্গের বাইরে তৃণমূলের অস্তিত্ব অন্য রাজ্যে নেই।

চটি পিসি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে তাৎক্ষণিক তিন তালাক বা তালাক-ই-বিদ্দত নিষিদ্ধ করে যে বিলটি সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে মোদী সরকার পেশ করতে চলেছে তার তীব্র বিরোধিতা করবে তৃণমূল কংগ্রেস। এই বিলটির নাম 'মুসলিম উইমেন প্রোটেকশন অব রাইটস অন ম্যারেজ'। সংসদে অনুমোদিত হলে বিলটি আইনে পরিণত হবে। এই আইনে তাৎক্ষণিক তিন তালাক নিষিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর সর্বোচ্চ তিন বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড ও জরিমানা হবে। বিলে আগেই তিন তালাকের শিকার হয়েছেন এমন মুসলমান মহিলাদের স্বার্থ রক্ষার রক্ষাকবচ রাখা হয়েছে। তাঁরা নিজের এবং সন্তানদের ভরণপোষণের জন্য তালাকদাতা স্বামীকে বাধ্য করতে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারবেন। গত আগস্ট মাসে সুপ্রিম কোর্ট তালাক-ই-বিদ্দত বেআইনি ও দেশের সংবিধান বিরোধী ঘোষণা করে এই বিষয়ে কড়া আইন আনার নির্দেশ দেয় কেন্দ্রীয় সরকারকে। সুপ্রিম কোর্টের রায়কে বিপুলভাবে স্বাগত জানায় ভারতীয় মুসলিম উইমেন পার্সোনাল ল বোর্ড। দেশের মাত্র দু'জন রাজনীতিক মুসলমান মহিলাদের স্বার্থরক্ষার বিরোধিতা করেছেন। প্রথম জন, তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দ্বিতীয়জন উত্তরপ্রদেশের সমাজবাদী পার্টি নেতা অখিলেশ যাদব। মুসলমান মহিলাদের আক্রোশে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় ভোটে অখিলেশ যাদবের দল ক্ষমতাচ্যুত হয়। লাভবান হয় বিজেপি।

তাৎক্ষণিক তিন তালাক নিষিদ্ধ করে মুসলমান মহিলাদের স্বার্থরক্ষার বিরোধিতায় আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। নেত্রী বিশ্বাস করেন পুরুষ শাসিত মুসলমান সমাজে চার বিবি এবং তিন তালাক দেওয়াটা মুসলমান পুরুষের জন্মগত ধর্মীয় অধিকার। হ্যাঁ, এটাই তোষণ নীতি। কারণ, তিনি মনে করেন, মোল্লা মৌলবিদের তুষ্ট করলে রাজ্যের ৩১ শতাংশ মুসলমান ভোট তৃণমূলের ঝুলিতে পড়বে। অখিলেশ যাদবও তাই ভেবেছিলেন। এবং ডুবেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান ভোটদাতাদের অর্ধেক মহিলা ভোটার। তাঁরা রুখে দাঁড়াবেনই। মোল্লা মৌলবিদের তোষণ করে ভোটে জেতার স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে। পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির যে উত্থান ঘটতে চলেছে তার নেপথ্যে রাজ্যের মুসলমান মহিলাদের খুশির প্রতিফলন থাকবে। এটা আমার বিশ্বাস। গ্রামীণ মুসলমান সমাজে মেয়েরা এখন স্কুলে কলেজে যাচ্ছে। শিক্ষার আলো অন্ধকার সমাজে প্রবেশ করছে। তাঁরা পুরুষের যৌন ক্রীতদাসী হয়ে থাকতে চাইবেন না। মমতা তাৎক্ষণিক তিন তালাকের যতই বিরোধিতা করুন না কেন মুসলমান মহিলারা সাড়া দেবেন না। কারণ, তাঁরা ভুক্তভোগী। আইনের দেওয়া অধিকার তাঁরা বিসর্জন দেবেন না সহজে। ■

গদি নয়, গান্ধী বদল

প্রিয় কংগ্রেস-প্রিয় জনতা,

আপনারা নিশ্চয়ই আনন্দে রয়েছেন। আবার এক গান্ধী আপনাদের হর্তা, কর্তা, বিধাতা হলেন। কিন্তু কখনও ভেবে দেখেছেন কি কেন এমন পরিবারতন্ত্রের গোলামি করবেন!

নরেন্দ্র মোদী কটাক্ষের সুরে তাঁকে 'শাহজাদা' বলে ডাকেন। অনেকে তাঁকে ব্যঙ্গ করে 'পাপ্পু' বলে। কিন্তু তিনিই এখন সম্রাট। মালিকানা পেলেন ৯৮ বছরের পারিবারিক সম্পদের। ১৯১৯ সাল থেকে নেহরু-গাঁধী পরিবারের হাতেই কংগ্রেস নামক ভারতের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল। এ যেন রাহুলদের এক পারিবারিক সম্পদ। এমন মান্যতা দিয়েছেন আপনারা। কংগ্রেসের নেতা থেকে কর্মী, সমর্থক সকলে।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের 'ভকিল' মোতিলাল নেহরু ১৯১৯ সালে কংগ্রেসের সভাপতি হন। সেই শুরু। মাঝে অনেকেই কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্বে এসেছেন কিন্তু কংগ্রেস কখনও মোতিলালের উত্তরসূরিদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যায়নি। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী থেকে সুভাষচন্দ্র বসু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল থেকে কয়েক দশক আগে নরসিংহ রাও-সহ অনেকেই কংগ্রেস সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু পারিবারিক সূত্র কখনও ছিন্ন হয়নি। মোতিলালের উত্তরাধিকার বহন করেছেন জওহরলাল নেহরু। এর পরে কেন্দ্রের সরকার কিংবা কংগ্রেস দল চলে যায় নেহরু-গান্ধী পরিবারের দখলে।

জওহরলাল নেহরুর হাত ধরেই কন্যা ইন্দিরা এবং এর পরে তাঁর পুত্র রাজীব, পুত্রবধূ সোনিয়া কংগ্রেস সুপ্রিমোর দায়িত্বে এসেছেন। এবার সেই দায়িত্ব পেলেন রাহুল। সোনিয়া গান্ধী তবু একটা বদল এনেছিলেন। কংগ্রেস সভানেত্রীর দায়িত্ব, ইউপিএ চেয়ারপার্সনের গুরুভার সামলালেও প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসেননি। 'অন্তরাত্মার ডাকে' মনমোহন সিংহকে সসম্মানে চেয়ার ছেড়ে আড়ালে থেকেছেন। এবার ছেলের হাতে সঁপে দিলেন দলের দায়িত্ব।

দায়িত্ব পেয়ে কী করবেন রাহুল? এক বড় প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে কংগ্রেস রাজনীতি। স্বাধীনোত্তর ভারতে সব থেকে খারাপ সময়ের মধ্য দিয়ে চলেছে কংগ্রেস। এমন দুর্বলতা আগে দেখা যায়নি। তাই এমন এক সময়ে এসে ক্ষমতার রাশ হাতে নিতে হচ্ছে রাহুলকে, যখন 'ক্ষমতা' ক্রমেই ক্ষয়িষ্ণু। দিদি প্রিয়াঙ্কার রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সম্ভাবনা ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসছে। অন্যদিকে, অকৃতদার রাহুল এখনও নিজের বিয়ে নিয়ে চিন্তিতই নন। কিছুদিন আগেই তাঁর বিয়ে প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, "যা হওয়ার, তা হবে। আমি কপালে বিশ্বাস করি।"

কিন্তু কেমন তাঁর কপাল? 'পারিবারিক সম্পদ' হিসেবে পাওয়া দলের সর্বোচ্চ দায়িত্ব তাঁর উপরে কি নতুন চাপ তৈরি করবে? বিজেপির হাতে থাকা 'পরিবারতন্ত্র' নামক অস্ত্রকে আরও শক্তিশালী করে দেবে?

'গান্ধী পরিবার'-এর ব্র্যান্ডিং তো আর কম নয়। তৃণমূল কংগ্রেস-সহ অনেক কংগ্রেস ভেঙে তৈরি হওয়া দল এখনও কংগ্রেসের নিন্দা করলেও গান্ধী পরিবার সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করার আগে থমকে যায়। দাসত্ব ভুলতে পারে না। এই তো, তিন বছর আগে লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেসের সঙ্গে সমাজবাদী পার্টির কোনও জোট না হলেও 'পরিবার-জোট' আটকানো যায়নি। ছ'টি আসনে পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রার্থী দেয়নি দুই দল। আর তার জোরেই বিপুল মোদী হাওয়ার মধ্যেও অক্ষুণ্ণ থেকে যায় গান্ধী পরিবারের মা ও ছেলের আসন। অন্যদিকে, মুলায়ম সিংহ-সহ যাদব পরিবারের চারটি আসন।

উত্তরপ্রদেশ, বিহারে পরিবারতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই দিয়েছে নরেন্দ্র মোদীর দলকে। বিজেপি 'পরিবারতন্ত্র' বিরোধী স্লোগান এখন চাঙ্গা। এই বাংলাতেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পিসি-ভাইপো 'পরিবারতন্ত্র' শুরু হতেই বিসর্জনের ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে বিজেপি।

এখন দেশের যা অবস্থা তাতে মোদী-শাহ জোটের বিজয়রথকে থামিয়ে দেওয়া সহজ কাজ নয়। রাজ্যে রাজ্যে 'সাইনবোর্ড' হয়ে যাওয়া কংগ্রেসকে চাঙ্গা করা ছেলেখেলা নয়। সত্যিই কঠিন পিচে ব্যাট করতে নামলেন রাহুল।

রাহুল গান্ধী অবশ্য একটা বড় সুবিধা আছে। তিনি কথায় কথায় বেড়াতে চলে যান। গোটা পৃথিবী ঘুরে বেড়ান। কী করতে কোথায় যান সেটা নিয়ে রহস্য থেকেই যায়। আর মামাবাড়ি ইতালি তো আছেই। কিন্তু তাঁকে মনে রাখতে হবে ডোবা কংগ্রেসকে টেনে তোলাটা মামাবাড়ির মোয়া নয়।

—**সুন্দর মৌলিক**

আফরাজুলের হত্যাকাণ্ড এবং মিডিয়ার আস্তিন-গুটানো দাদাগিরি

সন্দীপ চক্রবর্তী

কিছুদিন আগে ফেসবুকে একটি অভিনব চাকরির বিজ্ঞাপন অনেকেরই চোখে পড়ে থাকবে। সেই বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল, 'মঙ্গলগ্রহে জল পাওয়া গেছে। ঘোলা করার জন্য বাঙালি প্রয়োজন।' কথাটা সাধারণ বাঙালি সম্বন্ধে না খাটলেও, বাংলা মিডিয়া সম্বন্ধে একেবারে অক্ষরে-অক্ষরে মিলে যায়। মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর স্বচ্ছ ভারত থেকে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, নোটবাতিল থেকে জিএসটি— বিভিন্ন ইস্যুতে বাংলা মিডিয়া তার প্রমাণ দিয়েছে। সম্প্রতি বাংলা মিডিয়ার জল ঘোলা করার আর একটি হাতেগরম প্রমাণ পাওয়া গেল মালদার ঠিকা শ্রমিক মহম্মদ আফরাজুলের হত্যাকাণ্ডে। পাবলিককে খবরের নামে আর ডি এক্স খাওয়াতে ব্যস্ত মিডিয়া ভেবেই দেখল না চচ্চড়িতে ভুল করে মটন কষার মশলা পড়ে গেল না তো? বাড়াবাড়ি রকমের মুসলমান তোষণ যে অবস্থাবিপাকে পড়ে মুসলমান শোষণে পরিণত হচ্ছে, সেটুকু বোঝার মতো সংবেদনশীলতাও আজকের বাংলা মিডিয়ার নেই। যেন তেন প্রকারে নিহত আফরাজুলের পরিবারের কাউকে দিয়ে 'খুন কা বদলা খুন'-জাতীয় বিবৃতি দেওয়াতেই হবে, সম্ভবত এরকম কোনও মাথার দিব্যি বাংলা মিডিয়াকে কেউ দিয়ে থাকবে। তাই হত্যাকাণ্ডের খবর আসা মাত্র শুরু হয়ে গেল মিডিয়ার আস্তিন গুটানো দাদাগিরি।

মৃত্যু মাত্রেই দুঃখের। বিশেষ করে সেই মৃত্যু যদি এমন নৃশংসভাবে হয়। সকলেই চাইবেন হত্যাকারীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। একজন মানুষকে গাঁইতি দিয়ে কুপিয়ে তারপর পুড়িয়ে হত্যা করা হচ্ছে, একথা একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে বাস করে বিশ্বাস করা কঠিন। শুধু তাই নয়, একেবারে শুরু থেকে শেষপর্যন্ত ঘটনাটির ছবি তুলে ফেসবুকে পোস্ট করা হয়েছে। হত্যাকারীর এই আচরণে তার মানসিক সুস্থতা সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগতে বাধ্য। কিন্তু তার জন্য সঙ্ঘ বা বিজেপিকে কীভাবে দায়ী করা যায়? গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনের মাত্র এক সপ্তাহ আগে একটি বিজেপি-শাসিত রাজ্যে এমন আহাম্মকি করার ঝুঁকি যে বিজেপি নেবে না সেটা তো পাগলেও বুঝবে। বরং দেখা দরকার বিজেপির বদনাম হলে বা তাদের কোনওভাবে অপদস্থ করতে পারলে কাদের লাভ! কার মোটিভ সব থেকে শক্তিশালী? উত্তরটা সকলেই জানেন, কংগ্রেস। বিজেপি গাড্ডায় পড়লে কংগ্রেসের লাভ। গলা ফাটিয়ে বলা যাবে, হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সারা দেশে 'হিন্দু সন্ত্রাস' কায়েম করতে চায়। নরেন্দ্র মোদীর জমানায় মুসলমানরা নিরাপদ নন ইত্যাদি। যার অবশ্যম্ভাবী প্রভাব পড়বে ভোটে। বিশেষ করে মুসলমান ভোটে। কারণ কিছুদিন আগেই দেখা গেছে উত্তরপ্রদেশে মুসলমানরা বিজেপিকে ঢেলে ভোট দিয়েছেন। বারবার যদি একই জিনিস ঘটতে থাকে তাহলে রাহুল গান্ধীর পক্ষে ইতালি চলে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না। সুতরাং আফরাজুল হত্যাকাণ্ডে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের প্রসঙ্গটি পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। হয়তো এখনই এই নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিলে তা অতি সরলীকরণ হয়ে যাবে। কিন্তু সম্ভাবনার দিকটি নিয়ে ভাবা যেতেই পারে।

ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনার প্রথম ধাপ হত্যাকারী শম্ভুলাল রেগর নিজেই। তার বাড়ি রাজস্থানের রাজসমন্দ জেলায়। এক সময় সে মার্বেল পাথরের ব্যবসা করত। গত দু'বছর ধরে বেকার। সে যে পাকা ক্রিমিন্যাল নয় তার প্রমাণ ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। কোনও ক্রিমিন্যাল খুনের ছবি ফেসবুকে পোস্ট করে না। কোনও প্রমাণই তারা রাখতে চায় না। অথচ শম্ভুলাল সব প্রমাণ চোখের সামনে সাজিয়ে রেখেছে যাতে পুলিশ সহজেই তাকে গ্রেপ্তার করতে পারে। হয়েছেও তাই। তা হলে কি সে খুন করতে চায়নি, তাকে কেউ উসকে দিয়েছিল? না, প্রশ্নটা এই নিবন্ধ লেখকের নয়। একটি বহুল প্রচারিত বাংলা সংবাদপত্রের। লাগাতার সঙ্ঘ-বিজেপির নামে বিষোদ্গার করার পর তারা শেষমেশ এই সংশয় প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছে। অর্থাৎ তারা মানছে উস্কানিদাতা বিজেপি নয়, অন্য কেউ। বিজেপি-শাসিত রাজ্যে এমন একটি কাণ্ড ঘটাতে পারলে যাদের লাভ এক্ষেত্রে উস্কানিদাতা তারাই।

আফরাজুল খুন হবার পর বাংলা মিডিয়া একে লভ জিহাদের ঘটনা বলে চাউর করার চেষ্টা করেছিল। কীসের ভিত্তিতে এই প্রচার তা বলা মুশকিল। পরে যখন আফরাজুলের বাড়ি থেকে বলা হলো যে, না, এরকম কোনও ঘটনা ঘটেনি। অর্থাৎ আফরাজুল লভজিহাদের শিকার নয়। তখন মিডিয়া খান্ত হলো। এখন প্রশ্ন হলো, আফরাজুল হত্যাকাণ্ডের পিছনে কী কারণ থাকতে পারে?

এরকম একটি নৃশংস ঘটনা ঘটে যাবার পর শম্ভুলাল রেগরের প্রতিবেশীরাই অবাক হয়ে গেছেন। চিরকালের শান্ত-নিরীহ মানুষটা এমন একটি ভয়ানক কাণ্ড ঘটাতে পারেন তারা বিশ্বাসই করতে পারছেন না। শম্ভুলালের প্রতিবেশী, একটি পানের দোকানের মালিক রাকেশ কুমার রেগর বলেন, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। অনেকদিন ধরে ওকে চিনি। বিশ্বাসই হয় না ও এরকম একটা কাজ করতে পারে।' প্রতিবেশীরাই জানিয়েছেন, শম্ভুলালের তিন ছেলেমেয়ের মধ্যে বারো বছরের একটি মেয়ে মানসিক প্রতিবন্ধী। উন্মাদও বলা যায়। মেয়েকে খুবই ভালোবাসে শম্ভুলাল। জানে ওই মেয়ের কোনওদিন বিয়ে হবে না। এই নিয়ে সে সারাক্ষণ উদ্বেগের মধ্যে থাকত। বুকে ট্যাটু আঁকিয়েছিল। ট্যাটুতে মেয়ের মুখ। এরকম একটা লোক কীভাবে মানুষ খুন করতে পারে?

শুধু নিজের ছেলেমেয়ে নয়, পাড়া-প্রতিবেশীর প্রতিও শম্ভুলাল ছিল সমান

সংবেদনশীল। সম্ভবত এই সংবেদনশীলতার কারণেই সে ঘোরতরো এক সঙ্কটে পড়েছিল, যার সঙ্গে তার হত্যাকাণ্ডের যোগসূত্র থাকলেও থাকতে পারে। কিংবা যারা তার এই সঙ্কটের কথা জানেন তারা তাকে ব্যবহারও করে থাকতে পারেন।

২০১০ সালে অনিতা রেগর (নাম পরিবর্তিত) মহম্মদ বাবলু শেখ নামে এক যুবকের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। অনিতার বয়েস তখন ১৩। সে পুলিশকে জানিয়েছে, ম্যাজিক দেখিয়ে বাবলু তাকে বশ করেছিল। বাবলুর বাড়ি মালদার সৈয়দপুরে। স্মরণ করুন পাঠক, নিহত আফরাজুলের বাড়িও সৈয়দপুরে! অনিতার বয়ান অনুযায়ী, যে জায়গায় তাকে রাখা হয়েছিল তা খুবই বিপজ্জনক। তার ভাষায়, 'ওরা খুব সহজেই মানুষ খুন করতে পারে।'

অনিতার মায়ের অনুরোধে শম্ভুলাল গিয়েছিল তাকে ফিরিয়ে আনতে। অনিতা পুলিশকে বলেছে, 'ও যখন গিয়েছিল আমি ওকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। কারণ ওর সঙ্গে গেলে আমাদের দু'জনকেই ওরা মেরে ফেলত। পরে অনিতা সৈয়দপুর থেকে পালাতে সক্ষম হয়। ফিরে আসে রাজস্থানে। শম্ভুলালের সঙ্গে অনিতার ভাইবোনের সম্পর্ক। প্রতি বছর অনিতা তার ভাইয়ার হাতে রাখি বাঁধে। কিন্তু রাখি-বোনের প্রতি শম্ভুলালের এই দায়িত্ববোধ ক্ষমা করেনি সৈয়দপুর। আফরাজুল তাকে চিনতে পেরেছিল। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, সে প্রায়ই হুমকি দিত শম্ভুলালকে। কেন সে তাদের ডেরা থেকে বের করে আনল অনিতাকে? একবার সৈয়দপুরের বাঙালি মুসলমানেরা বেধড়ক মেরে শম্ভুর হাতও ভেঙে দিয়েছিল। প্রতিবেশীরা দেখেছেন তার প্লাস্টার করা হাত। সুতরাং হত্যার শক্তিশালী মোটিভ শম্ভুলালের আছে। কিন্তু তাকে আর যাই বলা হোক, নির্বোধ বলা যাবে না। অন্তত হত্যাকাণ্ডের ছবি ফেসবুকে পোস্ট করে জাহির করার মতো নির্বোধ সে নয়। এখানেই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনা দেখছেন প্রতিবেশীরা। রাজস্থান পুলিশের একাংশের অনুমান, আফরাজুলের প্রতি শম্ভুলালের ক্রমশ বাড়তে থাকা ক্ষোভ-বিতৃষ্ণা ব্যবহার করে সহজেই তাকে দিয়ে খুন করানো সম্ভব। এমনকী অন্য কাউকে দিয়ে খুন করিয়ে, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে তার জায়গায় শম্ভুলালের ছবি সুপারইমপোজ করাও সম্ভব। সেরকম কিছু করা হয়ে থাকলে মোটিভের সূত্র ধরে পুলিশ শম্ভুলালকে ধরবে। ফরেনসিক পরীক্ষায় ভিডিয়োটি জাল প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত খুনি ধরা পড়বে না।

মুখ্যমন্ত্রী কি শুধু রাজ্যের বাইরে থাকা মুসলমানদেরই বিপদে পড়লে ফিরে আসতে বলেছেন, নাকি হিন্দু-মুসলমান উভয়কে। কারণ আফরাজুল মারা যাবার কয়েকদিনের মধ্যেই বাঁকুড়ার হেমন্ত রায়কে কেরলে গলার নলি কেটে খুন করা হয়েছে। অথচ মমতা এখনও পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের কথা বলেননি। মমতার স্নেহভরা নজর থেকে বঞ্চিত হয়েছেন সম্প্রতি বিহারের চম্পারণ জেলায় লভজিহাদের শিকার মুকেশ কুমার এবং তার স্ত্রী নূরজাহানও।

এদিকে আফরাজুল খুন হবার পরেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যথারীতি ঘোলাজলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছেন। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আফরাজুলের পরিবারকে দু' লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেবার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে তিনি বলেছেন, যেসব ব্যক্তি পেশাগত কারণে রাজ্যের বাইরে থাকেন, তারা যদি হুমকি-টুমকি পান কিংবা যদি মনে করেন তাদের প্রাণসংশয় হতে পারে তাহলে তারা যেন পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসেন। সরকার তাদের দায়িত্ব নেবে। তাদের একশো দিনের কাজ দেওয়া হবে, চাইলে দু'শো দিনেরও দেওয়া যেতে পারে। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার চব্বিশঘণ্টার মধ্যেই নিহত আফরাজুলের পরিবারের এক সদস্য জানিয়েছেন, তিনি আবার রাজস্থানে ফিরে যেতে চান। কারণ দিনে চারশো টাকা মজুরি এখানে কেউ দেবে না। আরও একটা বিষয় নিয়ে সামান্য সংশয় দেখা দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী কি শুধু রাজ্যের বাইরে থাকা মুসলমানদেরই বিপদে পড়লে ফিরে আসতে বলেছেন, নাকি হিন্দু-মুসলমান উভয়কে। কারণ আফরাজুল মারা যাবার কিছুদিনের মধ্যেই বাঁকুড়ার হেমন্ত রায়কে কেরলে গলার নলি কেটে খুন করা হয়েছে। অথচ মমতা এখনও পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের কথা বলেননি। মমতার স্নেহভরা নজর থেকে বঞ্চিত হয়েছেন সম্প্রতি বিহারের চম্পারণ জেলায় লভজিহাদের শিকার মুকেশ কুমার এবং তার স্ত্রী নূরজাহানও। মুসলমান হিন্দুকে মারলে তিনি নীরব থাকেন। এমনকী মুসলমান মুসলমানকে মারলেও তেমন রা কাড়েন না। শুধু হিন্দুর হাতে মুসলমান মারা গেলে তার স্নেহ উথলে ওঠে।

মুসলমান আবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে ভোট কুড়োবার খেলায় নেমে মমতা আর একটা কাজ করেছেন। পুরো তৃণমূল টিমকে নামিয়ে দিয়েছেন মালদা-মুর্শিদাবাদে। মালদা প্রয়াত কংগ্রেস নেতা গণিখান চৌধুরীর বশংবদ জেলা। আফরাজুল এবং তার পরিবারও ব্যতিক্রম নয়। সুতরাং এই তো সুযোগ কংগ্রেসের কব্জা থেকে মালদা জেলাকে ছিনিয়ে নেবার। কংগ্রেসও হাল ছাড়তে নারাজ। তারা মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষতিপূরণ দেবার ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে বলেছে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে কেন লোকে দল বেঁধে বাইরে চলে যাচ্ছে সেটা দেখাও মুখ্যমন্ত্রীর কর্তব্য।

মোটকথা দড়ি টানাটানি চলছে। মধ্যযুগের বাদশাহ্-সুলতানদের মতোই মমতা মুসলমানদের রক্ষা করছেন। এবং সেইসঙ্গে সুকৌশলে হিন্দুদের মনে ছড়িয়ে দিচ্ছেন এক ধরনের অনিশ্চয়তা। মধ্যযুগে বাদশাহরা গায়ের জোরে ধর্মান্তরণ করাত। মমতার পক্ষে তা সম্ভব নয়! কিন্তু এমন একদিন যদি আসে যখন স্রেফ মুসলমান হওয়ার কারণেই অফিসে বেশি ইনক্রিমেন্ট হবে। চাকরির সুযোগ থাকবে বেশি। সেদিন কি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিন্দুরা শুধু একটু ভালো থাকার জন্যেই ধর্মান্তরিত হবেন না? এই লক্ষ্যেই কি মমতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা কাজ করে চলেছেন? এবং মিডিয়া যোগ্য সঙ্গত করছে?

এসব প্রশ্নের উত্তর সময় দেবে। আমরা শুধু সম্ভাবনাগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম।

বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম : দুঃসংবাদের অবিরল ধারা

গৌতম কুমার মণ্ডল

মিডিয়া বিশেষ করে ইলেকট্রনিক মিডিয়া এখন সর্বগ্রাসী। আমাদের প্রত্যেকের বসার বা খাওয়ার ঘরে সাজানো থাকে এক একটি টেলিভিশন সেট। তাতে অজস্র বেসরকারি চ্যানেল দিবারাত্রি খবর পরিবেশন করে। হিন্দি, ইংরেজি ও বাংলা ছাড়াও আমরা দেখতে পারি অন্য রাজ্যের প্রাদেশিক ভাষার খবর। অন্যান্য ভাষার মতো বাংলার ক্ষেত্রেও এই খবরের চ্যানেলগুলি খবর নিয়েই ব্যবসা করে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী একবার এদের কাজকে বলেছিলেন 'নিউজ ট্রেডিং'। যথার্থ সংবাদ পরিবেশন এদের মূল কাজ নয়। মূল কাজ হলো খবর পরিবেশনের মাধ্যমে ব্যবসা করা। খবর এদের ব্যবসার কাঁচামাল। ২৪ ঘণ্টা চালানোর জন্য একই খবরকে তাদের বারবার দেখাতে হয়। একই কথা যেমন সংবাদ পাঠক বা পাঠিকা বলেন, তেমনি কখনো কখনো সেই সামান্য কথাকেই ভাষার ফুলঝুরি দিয়ে প্রলম্বিত করেন স্টুডিওতে থাকা অথবা স্টুডিওর বাইরে থাকা কোনো সাংবাদিক। এভাবে একটি সংবাদ শেষ হয়ে যাবার পর আপনি ভাবতে পারেন, খবরটি কত ছোটো কিন্তু তাকে কতক্ষণ ধরে কত প্রলম্বিত রূপ দেওয়া হলো। কাঁচামালকে তারা এভাবে বাড়ান, এভাবে সময় কাটান আর আমাদের আটকে রাখেন টিভি-র পর্দায়।

খবর পরিবেশন করে চ্যানেলগুলির লাভ নেই, তাদের লাভ বিজ্ঞাপনে। সত্যি কথা হলো বেসরকারি খবরের চ্যানেলগুলির মূল লক্ষ্য বিজ্ঞাপন প্রচার। উপলক্ষ্য হলো সংবাদ পরিবেশন। কিন্তু আমাদের কাছে তারা উপলক্ষ্যটাকেই লক্ষ্য বলে প্রচার করেন এবং আমরাও সেটা বুঝে থাকি। তাই এই চ্যানেলগুলিতে নিরন্তর চলতে থাকে বিজ্ঞাপন আর মাঝে মাঝে দর্শকদের ধরে রাখার জন্য আসে খবর। এভাবেই এই চ্যানেলগুলি আমাদের বিজ্ঞাপন দেখতে বাধ্য করে।

আমাদের বাংলা নিউজ চ্যানেলগুলি হলো অনেকটাই আঞ্চলিক খবরের চ্যানেল। বেশিরভাগ সময়ই তারা আমাদের জেলায়, থানায়, গ্রামে, মফস্সলে, হাসপাতালে, রাস্তাঘাটে কী ঘটছে তা দেখায়। কিন্তু যে-কোনো সময় আপনি যদি খবর দেখতে মিনিট পাঁচেকের জন্য কোনো চ্যানেলে আসেন তাহলে আপনি নিশ্চিত কয়েকটা মৃত্যুর, সংঘর্ষের, ধর্ষণের, খুনের কিংবা পথ-দুর্ঘটনায় মানুষের মৃত্যুর খবর পাবেন। আপনি যখন খুললেন তখন হয়তো বিজ্ঞাপন চলছে কিন্তু নীচে স্ক্রল হতে থাকবে দুঃসংবাদগুলি। বিজ্ঞাপন শেষ হলেই টিভির পর্দায় হয়তো দেখা যাবে মুখঢাকা ধর্ষিতার বা নির্যাতিতার ক্যামেরার সামনে কথা বলা অথবা হাসপাতালে স্ট্রেচারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সংঘর্ষে আহত কোনো ব্যক্তিকে অথবা কাপড়ে ঢাকা কোনো মৃতদেহ আর তার সঙ্গে সব হারানো স্বজনদের ক্রন্দন। এটা দিনের যে কোনো সময় খবরের চ্যানেলে খবরের বিষয় সম্পর্কে আপনার এক ধরনের স্যাম্পেল সার্ভে। যে কোনো সময় পাঁচ মিনিট বাংলা খবরের চ্যানেলে এসে এরকম সার্ভে করলে আপনি দেখবেন এখন খবর মানেই যেন হত্যা, রক্তপাত, খুনখারাবি, ধর্ষণ, দুর্ঘটনা কিংবা রাজনৈতিক কোন্দল, গোষ্ঠীসংঘর্ষ এবং শেষ পর্যন্ত মানুষের মৃত্যু। এ জাতীয় খবর যখন সজোরে আপনার ড্রয়িংরুমে চলতে থাকে, আপনার বাড়ির শিশু, কিশোর, ছেলে-মেয়েদের মধ্যে তার কি কোনো বিরূপ প্রভাব পড়ে না? তারা কি ভাবতে শেখে না তাদের চারপাশটা, তাদের সমাজ, তাদের দেশ বা রাজ্য এরকমই? এখানে যে-কোনো সময় যেন হত্যা- মৃত্যু-খুনখারাবি-ধর্ষণ কিংবা হিংসার রাজনীতি! এখানে এভাবেই মেয়েদের অসম্মান করা যায় কিংবা মানুষকে খুন করা যায়! শুধু শিশু কিশোর বা যুবাদের মনেই নয়, বড়দের মনেও এইসব খবরের কোনো বিরূপ প্রভাব যে পড়ে না তা কে বলতে পারে? ব্যক্তিগতভাবে আমার অনেক সময় খবরের চ্যানেল খুলতে ভয় করে। চারদিকে ট্রেনে, বাসে, মোটর সাইকেলে ঘুরে বেড়াই তাতে অ্যাক্সিডেন্টের খবর আমাকে আতঙ্কিত করে। আমি ভয় পাই ধর্ষণের খবরে। যে মেয়েটির বা বধূটির উপর অত্যাচারের বিস্তৃত সচিত্র বিবরণ দেখি তাতে ওই নির্যাতিতাকে আমার বড় আপনজন, আমার ঘরের নিকটজন বলে মনে হয়। আমি ভয় পাই। জানি না সেটা আমার মানসিক দোষ কিনা।

এভাবে খবরে ভয় পাওয়া বা লাগাতার খুন-ধর্ষণ-রক্তপাতের খবর সম্পর্কে মনের মধ্যে জেগে ওঠা বিতৃষ্ণাকে আমরা খবরের সন্ত্রাস বা সংবাদ-সন্ত্রাস বলে অভিহিত করতে পারি। যা আমাদের ভয় দেখায়, সন্ত্রস্ত করে, আতঙ্কিত করে; গোপনে মনের মধ্যে অন্ধকার আর ভয়ের ছায়া বিস্তার করে তা সন্ত্রাস। এ ধরনের রক্তপাত-হত্যা-নিষ্ঠুরতা-ধর্ষণ-সংঘর্ষের খবর ড্রয়িংরুমে বা ডাইনিংরুমে যখন চলমান ছবি-সহ গমগম করে চলতে থাকে তখন তা আমাদের ঘরের পরিবেশকেও নষ্ট করে দেয়। প্রতিদিন এ জাতীয় খবর দেখলে ক্রমাগত এই হিংসা আমাদের শিশু-কিশোরদের মনের সুকুমার বৃত্তিগুলির উপর একটা মোটা কালো দাগ বুলিয়ে দিতে পারে। ছোটোরা যা দেখে তাই করতে চায়। ক্রমাগত ভালো বিষয় দেখলে তারা ভালো কাজ করবে এটা যেমন আশা করা যায় তেমনি উল্টোটাও সত্য হতে পারে। সংবাদ তো আমাদের সমাজ ও জীবন-সম্পৃক্ত বিষয়। সংবাদের এই হিংসা যুবা-কিশোরদের মনে প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে। তাই সংবাদের হিংসা হয়তো বাড়িয়ে তুলছে সমাজের হিংসাকে। হিংসা হিংসাকে বাড়াচ্ছে আর

তাই আবার খবরের চ্যানেলে উঠে আসছে। চলতেই থাকে হিংসা আর রক্তপাতের অন্তহীন স্রোত। আসছে পঞ্চায়েত নির্বাচন। পঞ্চায়েত নির্বাচন মানেই তো এলাকা আর ক্ষমতা দখলের লড়াই। লড়াই যত এগিয়ে আসবে, আমাদের ভয় হয় হিংসার স্রোতও ততই না বেড়ে উঠে।

বাংলা খবরের চ্যানেলগুলির আর একটি বড় দোষ বেশ কিছু দুঃখজনক মৃত্যুকে তারা নিজেদের প্রয়োজনমতো এক একটি ইভেন্টে পরিণত করে। মৃত্যু সব সময়ই দুঃখের। কিন্তু বিশেষ কিছু মৃত্যুকে তারা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে এই মৃত্যুর দুঃখকে তারা সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে চায় তার বারবার প্রচার করে; সে সংক্রান্ত নানা ডিটেল বিবরণে; অনেক সময় কিছু গল্প তৈরি করে। যেমন সদ্য নিহত তরুণ পুলিশ কর্মী অমিতাভ মল্লিকের দার্জিলিংয়ে মৃত্যুর খবরকে কয়েকদিন ধরেই বার বার প্রচার করে আমাদের বাংলা খবরের চ্যানেলগুলি। তাঁর স্ত্রী ও পরিজনদের হাহাকার দেখিয়ে গোটা বাংলার পরিবেশকে কয়েকদিনের জন্য বেদনায় ভরিয়ে দিতে পেরেছিল আমাদের মিডিয়া। একই সঙ্গে মানুষের রাগকে সঞ্চারিত করতে চাইছিল কারও বিরুদ্ধে।

এভাবে খবর পরিবেশন অবশ্যই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আর খবরের পিছনে উদ্দেশ্য থাকলে কিছু খবর মিডিয়ায় আসে, আর অনেক খবর হারিয়ে যায় বা দু'চার লাইনেই সারা হয়ে যায়। অমিতাভ মল্লিকের মৃত্যুর কয়েকদিন পর তপন মণ্ডল নামে ২৫ বছরের এক বি এস এফ জওয়ানের মৃত্যু হয় পাক সেনাদের গোলায় কাশ্মীরের সাম্বা সেক্টরে। তপন মণ্ডলের বাড়ি ছিল এ রাজ্যেরই মুর্শিদাবাদ জেলার সাতুল গ্রামে। তপন ছিলেন অবিবাহিত। তাঁর মৃত্যুতে তাঁর মায়ের কান্না ও হাহাকার বাংলা খবরের চ্যানেলে সেরকম ভাবে উঠে আসেনি। এই মৃত্যু ইভেন্ট হয়ে ওঠেনি। কারণ তপনের মৃত্যু চ্যানেলগুলির কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারছিল না। বি এস এফ জওয়ানের মৃত্যু হবে সেটাই যেন স্বাভাবিক। মিডিয়ার এই উদ্দেশ্যপূরণের জন্য ছোটার পিছনে সাধারণত দুটি কারণ থাকে। এক. মিডিয়া হাউসের মালিকের কোনো রাজনৈতিক লাভ, তিনি কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা হয়তো পূরণ করতে চাইছেন। আর দুই. বাণিজ্যিক লাভ, বিজ্ঞাপনের সহজলভ্যতা।

সুধী পাঠকের নিশ্চয় মনে আছে এ বছরই আমাদের এ রাজ্যেই তেহট্টের স্কুলে যখন সরস্বতী পুজোকে নিয়ে ঝামেলা হলো, পুলিশ সরস্বতী মূর্তি পূজামণ্ডপ থেকে সরিয়ে দিল, এলাকায় তৈরি হলো তীব্র উত্তেজনা, রাজ্যসভায় বিষয়টি উঠল তখন এ রাজ্যের কোনো ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় এ খবর হলো না। অথচ জাতীয় চ্যানেলে হিন্দি এবং ইংরেজিতে তখন এ খবর হচ্ছে। এভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদের বাংলা খবরের চ্যানেলগুলি কিছু খবর সরিয়ে দেয়। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাকর খবর পরিবেশন না করা ভাল। কিন্তু একেবারেই চোখ বন্ধ করে রাখাও কোনো কাজের কথা নয়। অন্ধ হলেও প্রলয় তো বন্ধ থাকে না। এমনকী এক্ষেত্রে আজকের ইন্টারনেটের যুগে বিভিন্ন সোশ্যাল সাইটের মাধ্যমে যখন প্রচুর ভুল খবর ছড়াতে থাকে তা আরও বিপজ্জনক। তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদের খবরের চ্যানেলগুলি কিছু খবরকে যেমন সরিয়ে দেয়, কিছু খবর কয়েক লাইনেই সেরে দেয়, তেমনি কিছু খবরকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে, খবরকে ইভেন্টে পরিণত করে। এভাবে খবর পরিবেশন অবশ্যই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং সে উদ্দেশ্য রাজনৈতিক।

বাংলা খবরের চ্যানেলের অবিরল দুঃসংবাদধারা দেখে মনে প্রশ্ন জাগতে পারে আমাদের শহরে বাজারে, গ্রামেগঞ্জে কি ভালো সংবাদ নেই যেগুলিকে একটু সুন্দরভাবে পরিবেশন করা যায়? খবরের চ্যানেলগুলো দেখলে মনে হয় এদের ক্যামেরা যেন একেবারে আমাদের ঘরের মধ্যে এসে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। বহু খবর, বহু ভালো খবর এই চ্যানেল-ওয়ালাদের নাগালের বাইরে থেকে যাচ্ছে। খবর সংক্রান্ত এদের দৃষ্টিভঙ্গিটাই যেন নেতিবাচক। গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-নগরে সাধারণের নিত্য জীবনসংগ্রামের মধ্যে এমন কিছু ব্যতিক্রমী সোনালিরেখা কী থাকে না যা খবর হতে পারে? ঘরের মেয়েদের প্রতিদিনের সংগ্রাম, কিংবা ছেলে-মেয়েকে বড় করার জন্য অভাবী মায়েদের জীবনপণ লড়াই, প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েকে বড় করার জন্য দুঃখী মা-বাবার প্রতিমুহূর্তের যুদ্ধ, অভাবী ছেলে- মেয়েদের বড় হবার লড়াই— আমাদের খবরের চ্যানেল এসবের মধ্যে ঢুকতে পারে না। যদি পারত তাহলে খবরের পরিধি ও মাত্রা অনেক বেড়ে যেত, বদলে যেত। অর্থাৎ আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনসংগ্রামের কোনো ব্যতিক্রমী অঘটনকে খবরে দেখি না। খবর তাই যা সচরাচর ঘটে না। সচরাচর ঘটে না এরকম ভাল ঘটনা আমাদের দৈন্দিন জীবনে ঘটে বৈকি। কিন্তু খবরের চ্যানেল সেখানে পৌঁছতে পারে না। সেখানে শুধুই তৃণমূল-বিজেপি-সিপিএম, সেখানে শুধুই গোষ্ঠীকোন্দল-খুন-হিংসা-মৃত্যু-পুলিশ-ধর্ষণ-বোমাবাজি- অ্যাক্সিডেন্ট এই ভয়জাগানো সংবাদের রাশি।

খবরের চ্যানেলগুলি রাজনৈতিক নেতাদের পিছনে ঘোরে। একদিকে রাজনৈতিক নেতা, অন্যদিকে থানা-পুলিশ— এই দু'টিই চ্যানেলগুলির খবর সরবরাহ করে। কিন্তু সংবাদের এই দুটি উৎসই হলো নেতিবাচক উৎস। এইসব রাজনৈতিক নেতা আর থানাপুলিশ দেশগঠনে কতটুকু ভুমিকা পালন করে? সত্যিকারের দেশ যেখান থেকে গড়ে উঠছে সেই স্কুল-কলেজ, কৃষিক্ষেত্র, শিল্প-কারখানা, মা-বউয়েদের জীবনসংগ্রাম— এসব থেকে দূরেই থেকে যায় খবরের চ্যানেল। তাই খবর যেমন বিস্তৃত হচ্ছে না, তেমনি তা হচ্ছে না ইতিবাচক। খবর মানেই আমাদের কাছে আসছে শুধুই দুঃসংবাদের অন্তহীন স্রোত। ■

ধর্ম-সংস্কৃতির চেতনার অভাবে হিন্দু কন্যারা লভজিহাদের শিকার

প্রীতীশ তালুকদার

বেগম হাদিয়া ওরফে শ্রীমতী অখিলা অশোকন বলছে— 'আমি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে ওই মুসলমান যুবককে বিয়ে করেছি'। মিঞা-বিবি রাজি তো ক্যা করেগা কাজি। 'মেয়ের মগজ-ধোলাই করা হয়েছে, আমার মেয়ে লভজিহাদের শিকার' বলে বাপ যতই কান্নাকাটি আর ছুটোছুটি করুন, কোনো কাজেই আসবে না। তোমার মেয়ে, তুমি ছোট থেকে তাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে বড় করে তুলেছ, জীবনের অধিকাংশ সময় সে তোমাদের সংস্পর্শে ও সংস্কারেই থেকেছে, তা সত্ত্বেও বাইরের কেউ তোমার মেয়ের মগজটা হাইজ্যাক করে নিল কী করে? শুনতে খারাপ লাগলেও প্রশ্নটা কিন্তু খুব সঙ্গত।

'সর দেঙ্গে, শির নহি দেঙ্গে'— এ স্বাভিমান আসে নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্মতা থেকে, ভালোবাসা থেকে। একাত্মতা ও ভালোবাসা আসে জানা, বোঝা ও নিরন্তর অভ্যাস থেকে। নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্মতার এবং স্বাভিমানের জন্যই হাজার হাজার হিন্দু নারী জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাপ দিয়ে আত্মাহুতি দিয়েছেন, মৃত শরীরটাকে স্পর্শ করার সুযোগটুকুও বিধর্মীকে দেননি। আর আজ? হিন্দু মেয়েরা স্বেচ্ছায় বিধর্মী যুবকের ভালোবাসায় মোহিত হয়ে নিজ পরিবার, ধর্ম, সংস্কৃতি ত্যাগ করে কলমা পরে হিজাব চড়িয়ে খাঁটি মুসলমান হবার জন্য পাল্লা দিচ্ছে।

গত বৎসর এক শিক্ষক বন্ধু এসে বললেন, আমার স্কুলের একাদশ শ্রেণীতে পড়া এক ভালো হিন্দু পরিবারের ছাত্রী এক ফট্‌কা মুসলমান ছেলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। কেন এমন হচ্ছে বলুন তো। বললাম— মেয়েটির পরিবার এর কারণ। যেখানে মুসলমানরা দার-উল- ইসলামের লক্ষ্যে অ-মুসলমানকে মুসলমান বানানোর জন্য লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে সর্বদা নানা পথে সচেষ্ট, সেখানে হিন্দুরা 'জাত-ধর্ম বলে কিছু নেই', 'হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই', 'সবাই মানুষ', 'মানবতাই প্রকৃত ধর্ম' বললে মেয়ে তো জাত-ধর্ম দেখতে যাবে না, বিধর্মীদের কাজও অনেক এগিয়ে যাবে। পরেরদিন সেই শিক্ষক ওদের বাড়ি গিয়ে জানতে পারলেন, তারাও বিষয়টা জানে এবং তারা খুব চিন্তিত। শিক্ষকবন্ধু আমার বক্তব্য তাদের বলতেই তারা বলে— উনি ঠিকই বলেছেন। মেয়েকে বোঝাতে বা শাসন করতে গেলে সে আমাদের দিকেই আঙুল তুলে বলছে, তোমরাই তো বলো 'হিন্দু-মুসলমান সবাই মানুষ', 'মানবতাই ধর্ম'। মগজ ধোলাইয়ের তো প্রয়োজন নেই, বাড়ি থেকে যে সংস্কার পাচ্ছে তেমন করছে।

এমন ঘটনা ব্যতিক্রম নয়। এক দিকে বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের আঁচ করে 'লভজিহাদ' থেকে হিন্দু সমাজ ও হিন্দু মেয়েদের বাঁচাতে চিৎকার চলেছে, আর অপর দিকে পতঙ্গের মতো আগুনে ঝাপ দেবার মতো ঘটনা ঘটেই চলেছে। তার কারণ হলো খরগোশের মতো নিজের চোখ বন্ধ করে বাস্তবতাকে অস্বীকার করার প্রবণতা। 'লভজিহাদ' নিয়ে বেশ কিছু বছর থেকেই অভিযোগ হয়ে আসছে, কিন্তু দেশের প্রশাসন বা দেশের মানুষ তাতে বিশেষ পাত্তা দেয়নি। সম্প্রতি অখিলার হিন্দু পিতা অশোকনবাবুর অভিযোগের প্রেক্ষিতে কেরল হাইকোর্ট সেই বিয়ে নাকচ করে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থাকে তদন্তের নির্দেশ দেয়। অন্তর্বর্তী তদন্তে যে সব রোমহর্ষক তথ্য উঠে আসছে তাতে লভজিহাদের তত্ত্ব অনেকটাই মান্যতা পায়।

ইসলামে সকল মুসলমানের জন্য পাঁচটি অবশ্য করণীয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, নমাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত ও জিহাদ। কোরানের এই 'জিহাদ'-এর সঙ্গে ইংরেজি শব্দ 'লভ' যুক্ত হয়ে লভজিহাদ। লভ মানে প্রেম আর জিহাদ মানে ধর্মযুদ্ধ। কিন্তু দুই নারী-পুরুষের লভ বা ভালোবাসার সঙ্গে ইসলামি জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধের কী সম্পর্ক? এ হিন্দু দর্শন নয় যে, নিজের অভ্যন্তরের পাশবিক প্রবৃত্তি ও সমাজের অত্যাচারী দানবদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ হবে। যে ধর্মের ধর্মগ্রন্থে অন্য ধর্মের প্রতি ঘৃণা উগরে ভয়ানক শাস্তির ঘোষণা করা হয়েছে, ঘরের বৌ'কে ইচ্ছামতো তালাক দিয়ে পথে বের করে দেওয়া, খেতে না দেওয়া ও মারধোর করার নির্দেশ আছে তাতে এমন ভালোবাসার জয়গান সন্দেহের। তা যদি হতো তবে ধর্মান্তর বা ধর্মীয় গোঁড়ামির সেখানে কোনো স্থান হতো না। এই মহান প্রেমের ক্ষেত্রে সব সময় পাত্রটি মুসলমান আর পাত্রীটি হিন্দু হতো না, আর হিন্দু পাত্রীটিকেই নিজ ধর্ম ত্যাগ করে পাত্রের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হতো না। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে সবসময় পাত্রীকে ইসলাম কবুল করতে বাধ্য করা হচ্ছে তা না করলে কী হয় তাও সামনে এসে গেছে। পরধর্ম সহিষ্ণুতা, উদারতা দেখাতে নারাজ আসিফ

ও তার পরিবার। রশ্মির উপর ক্রমাগত চলতে থাকে ইসলাম কবুলের চাপ, শারীরিক ও মানবিক নির্যাতন, এমনকী খুনের চেষ্টাও। রশ্মির অভিযোগ— এটা 'লভ- জিহাদ'। মুসলমান সংসারে ঢুকে একেবারে কাছ থেকে দীর্ঘ তেরো বছরে রশ্মি যে অনেক কিছু দেখেছে, জেনেছে, বুঝেছে ও অনুভব করেছে।

কোরান অনুসারে আল্লাই একমাত্র ঈশ্বর এবং হজরত মহম্মদ প্রবর্তিত কোরান-নির্দিষ্ট ধর্মই একমাত্র ধর্ম, বাকি সব মিথ্যে ধর্ম। এই মিথ্যাধর্ম ও কাফেরদের পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে আল্লাহ্ ও মহম্মদের ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য যে অভিযান সেটাই ইসলামে জিহাদ। পথ দুটো— অ-মুসলমানকে ইসলামে দীক্ষিত করো, নতুবা খতম করো। ইসলামের বিস্তার এ ভাবেই সারা বিশ্বে হয়েছে, ভারতেও। এখন বিশ্বজুড়ে এই জেহাদেরই তাণ্ডব চলছে। ইসলামিক শাসনে তলোয়ারের ডগায়, গো-রক্ত ছিটিয়ে দিয়ে, গো-মাংস খাইয়ে দিয়ে, অবাধে নারী হরণ ও ধর্ষণ করে ধর্মান্তর করা হয়েছে নতুবা নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে এখনও এভাবে জিহাদ চলছে। ভারতে এক দিকে প্রত্যক্ষ ভাবে মারণাস্ত্র হাতে সন্ত্রাস ও খতম অভিযান চলছে, অপরদিকে ছল ও কৌশলে বিবিধ ছদ্ম পথে হিন্দুর ইসলামিকরণের চেষ্টা চলছে। রাজনৈতিক ভাবে ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠা, উগ্র ও আগ্রাসী ভাবে অপর ধর্মের নিন্দা ও ইসলামের প্রচার, আরবিয় অর্থের বলে মসজিদ-মাদ্রাসা বৃদ্ধি ও অন্যান্য ইসলামিক গতিবিধি বৃদ্ধি করে দবদবা কায়েম এর সূক্ষ্ম দিক। অপর দিকে প্রলোভন ও ছলনার দ্বারা সোজা পথে ধর্মান্তর, যা ভারতীয় আইনের মধ্যে থেকে নিরাপদে করা যায়।

এভাবে ইসলামে ধর্মান্তরকরণের অতি সাম্প্রতিক চক্রান্ত সামনে এসেছে তেলেঙ্গানা রাজ্যে। হিন্দু সেজে দরিদ্র হিন্দু সন্তানদের নিখরচায় থাকা খাওয়া ও পড়াশোনার ছলনায় নিয়ে এসে ধর্মান্তরণের চক্রান্ত। সেই ইসলামিকরণের উদ্দেশ্যই প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে হিন্দু মেয়েদের মুসলমান করাই লভজিহাদ। এটাই সবচাইতে ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে ভারতে। ওরা দার-উল- ইসলামের উদ্দেশ্য নিয়ে ঘৃণ্য কাফের অ-মুসলমানকে মুসলমান বানানোর জন্য হিন্দুর ঘরের মেয়েদের দিকে হাত বাড়াচ্ছে, আর আমরা মেয়েদের সচেতন করে তোলার পরিবর্তে প্রেমের জয়গানে মত্ত।

কৃষ্ণ ও বলরামের আদরের বোন সুভদ্রাকে নিয়ে অর্জুন পালিয়েছে। রুষ্ট বলরাম অর্জুনকে শাস্তি দিতে ধাওয়া করেছে। বাধ সাধল ভাই কৃষ্ণ। কৃষ্ণের কথায় বলরাম ফিরে গেল। কৃষ্ণ বলল তাই কী ফিরে গেল? না; যুক্তির সত্যতা বুঝেই ফিরে গেল। কী সেই যুক্তি? (১) অর্জুন সুযোগ্য পাত্র এবং কন্যার প্রতি কোনো অন্যায় হচ্ছে না। (২) কন্যার পরিবারকে নির্যাতন করা হচ্ছে না। (৩) সমাজের প্রতি কোনো অন্যায় করা হচ্ছে না। এটাই বিবেচ্য। কে বলেছে মেয়ে স্বাধীন, সে যাকে খুশি বিয়ে করতে পারে? রোগীকে জোর করে ওষুধ খাওয়ানো হয়, অনশনকারীকে জোর করে খাবার খাওয়ানো হয়, গাড়িচালককে জোর করে সিটবেল্ট বাঁধানো হয়, বাইক চালককে হেলমেট পরতে বাধ্য করা হয়, ভালো না লাগলেও ছেলে-মেয়েকে জোর করে পড়াশোনা করানো হয়। সেও তো তাদের নিজের জীবন, তারা বাঁচবে, মরবে, যা খুশি করবে তা তো বলা হয় না। জগতে কেউ পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নয়। বিয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার পরিবার, সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি। এক জনের ভুল কাজে ভুগতে হয় পরিবার ও সমাজকে। সবকিছুকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে যা খুশি করার অধিকার কারও নাই। বিধর্মীরা সংগঠিত ভাবে নানা পথে নিজেদের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে আর হিন্দুরা বোকার মতো বোগাস ধর্মনিরপেক্ষতা ও মহানতার মোহে তাদের ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যকেই সহায়তা করে চলেছে।

বলা ভালো সুকৌশলে তারা আমাদের দিয়ে তা করিয়ে নিচ্ছে। এমন একটা ভাব ভারতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যে, পৃথিবীতে মুসলমানরাই একমাত্র মহান ধর্মনিরপেক্ষতা ও মানবতার আদর্শে বিশ্বাসী। যারা তাদের সমর্থন করে বা যারা তাদের হয়ে কথা বলে তারাই আদর্শ মানুষ, আদর্শ রাজনৈতিক দল। সারা পৃথিবীর বাস্তব বলছে উল্টো কথা, সঙ্গে আছে ভারতের বর্তমান বাস্তব আর ইতিহাস। পাকিস্তান, আফগানিস্তান, আরব, সিরিয়া, ইরাকের মুসলমান আর ভারতের মুসলমান আলাদা নয়, তাদের কোরান ও পয়গম্বর আলাদা নয়, আলাদা নয় উদ্দেশ্যও। আমাদের ঘরের মেয়েরা সহজেই তাদের সেই উদ্দেশ্য পূরণের উপায় হয়ে উঠছে আমাদের দুর্বলতায়। ওই অখিলা হোক বা আমাদের আশপাশের মুসলমান হয়ে যাওয়া কোনো হিন্দু মেয়ে, যে আজ হিজাব পরে খাঁটি মুসলমান হয়েছে, নামাজ পড়ছে, কোরানের কথা বলছে, তাকে কি হিন্দুধর্মের শিক্ষা ও সংস্কার দেওয়া হয়েছিল? সে কী হিন্দু ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে কিছু জানে? যে কেউ পরীক্ষা করে দেখে নিতে পারেন তা হয়নি। স্বধর্ম বিষয়ে তার মস্তিষ্ক ফাঁকা। সে হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভাইয়ের পাঠটাই বেশি পেয়েছে, তার স্বধর্মের স্বাভিমান আসবে কোথা থেকে যে স্বাভিমান তাকে রক্ষা করবে?

সাদা কাগজ সহজেই ইচ্ছামতো রাঙানো যায়। ফলে যা হবার তা হয়ে চলেছে। কতিপয় হিন্দু যতই চেষ্টা করুক গোটা সমাজ সচেতন না হলে হিন্দু ও হিন্দু কন্যাদের রক্ষা সম্ভব নয়। এখনই হিন্দু ঘরের মেয়েদের ইসলামের কুরূপ চেনানো উচিত, আর উচিত নিজ ধর্ম, সংস্কৃতি ও স্বাভিমানের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা থাকলে সে কখনই লভজিহাদের খপ্পরে পড়তে পারে না। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

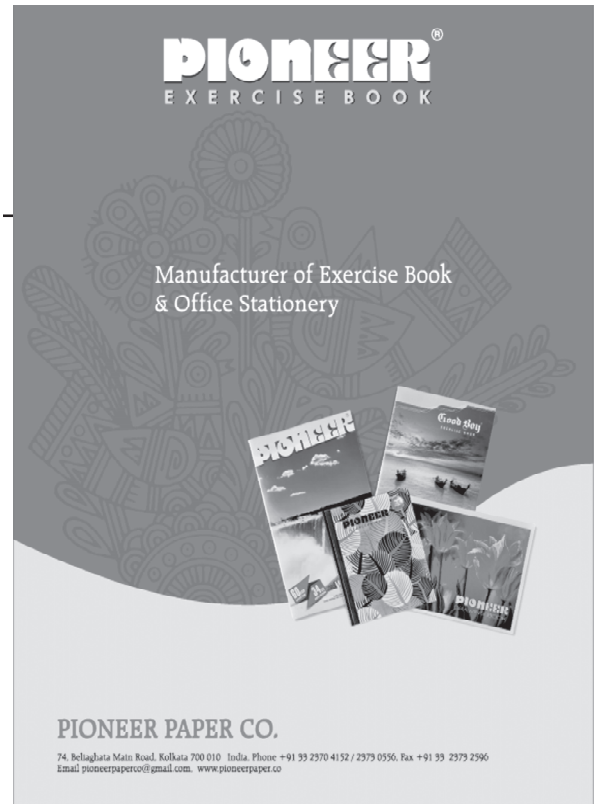

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

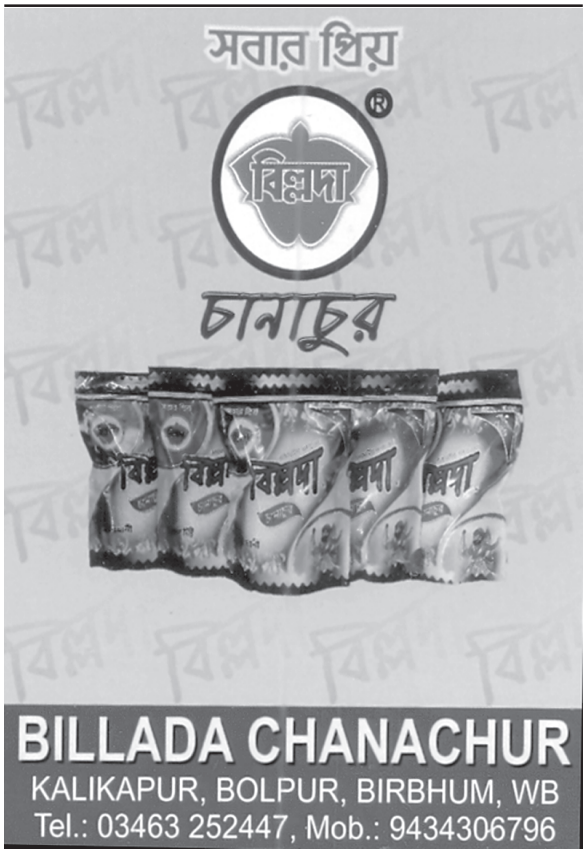

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি।। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুরা কেমন আছেন? পরিস্থিতি কেমন? এই দুই প্রশ্নের উত্তরে বিস্তারিত পরিসংখ্যান তুলে ধরার আগে সাম্প্রতিক সময়ের মাত্র কয়েকদিনের চিত্র তুলে ধরা যেতে পারে। যদিও এই চিত্র খণ্ডিত, মাত্র কয়েকদিনের। তবুও পরিস্থিতি বুঝতে এই যথেষ্ট।

ফেসবুকে এক ভুয়া অ্যাকাউন্ট থেকে ইসলাম ধর্মের অবমাননা হয়েছে এই অভিযোগ তুলে রংপুরের সদর উপজেলার ঠাকুরপাড়া গ্রামে গত ১০ নভেম্বর জুমার নমাজের পর হিন্দু পাড়ায় হামলা চালিয়ে ১২টি পরিবারের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, লুটপাট ও ভাঙচুর করা হয়েছে আরও ৭/৮টি বাড়িতে। হামলাকারীদের রুখতে পুলিশ গুলি চালালে একজন নিহত এবং প্রায় ৩০ জন আহত হয়। স্থানীয় হিন্দুদের অভিযোগ, জামায়াতে ইসলামি এই হামলা সংগঠিত করে। ফরিদপুরের সদর উপজেলার হাটকৃষ্ণপুরে ফেসবুকে ইসলাম অবমাননার অজুহাতে বিষ্ণুপদ মালোর দোকান পুড়িয়ে দেওয়া হয়। পরে পুলিশ বিষ্ণুপদকেই গ্রেপ্তার করে। এর আগে কক্সবাজারের রামু, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর, পাবনার সাঁথিয়ায় ফেসবুকে ধর্ম অবমাননার কথা বলে হিন্দুদের ওপর হামলা চালানো হয়েছিল। ইসলাম অবমাননার অজুহাত তুলে হিন্দুদের ওপর হামলা নতুন কৌশল।

১৭ নভেম্বর রাতে নওগাঁর আত্রাইয়ে কালিকাপুর গ্রামে কালিকাপুর কালী মন্দিরে হামলা চালিয়ে প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়েছে। হামলার অভিযোগে রানিনগর উপজেলার মিরাট ইউনিয়ন আওয়ামি লিগের সাংগঠনিক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম-সহ ৬ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। জানা যায়, কালিকাপুরে একটি সেচ প্রকল্প নিয়ে হিন্দুদের সঙ্গে আওয়ামি লিগ নেতা শহিদুলের বিরোধ চলছিল। একটি সমঝোতা বৈঠকের আয়োজনও করা হয়। কিন্তু বৈঠকে কোনো সমঝোতা হয়নি। রাতেই হামলা চালিয়ে প্রতিমা ভেঙে দেয় শহিদুল। ২০ নভেম্বর দুপুরে মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলার কাদিরপাড়া ইউনিয়নে রাধাকান্ত লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ মন্দির কম্পাউন্ডে একদল লোক হামলা চালিয়ে দুটি মন্দির ও শীতলা প্রতিমা ভাঙচুর করে। দিনের বেলা হামলার ঘটনা সাম্প্রতিক সময়ে এই প্রথম। স্থানীয় লোকজন ছুটে এসে হামলাকারীদের একজনকে ধরে ফেলে, সে স্থানীয় বিএনপির নেতা বলে জানা গেছে। তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। হামলায় মন্দিরের দুই ভক্ত আহত হন, তাদের মাগুরা জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গাজিপুর জেলায় শ্রীপুরে কাওরাইদ ইউনিয়নে মধ্যপাড়া এলাকায় উজ্জ্বল চন্দ্র বর্মণের বাড়িতে গত ১৯ নভেম্বর মধ্যরাতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। বাড়ির অনেকখানি অংশ পুড়ে গেছে। কয়েকদিন আগে নড়াইলের কালিয়া উপজেলায় একটি মন্দিরের পাঁচটি প্রতিমা ভেঙে দেওয়া হয়। সে মন্দিরটি কিংবদন্তী শিল্পী উদয়শঙ্কর ও রবিশঙ্করের পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের পৈতৃক বাড়িটি শত্রু সম্পত্তি হওয়ার পর সরকারের ডাকবাংলা হিসেবে এখন ব্যবহৃত হচ্ছে। এই হামলার জন্যে আওয়ামি লিগের অঙ্গ সংগঠন আওয়ামি যুবলিগকে দায়ী করা হয়েছে।

মাত্র দু' সপ্তাহের মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘটলো রংপুরের সদর উপজেলার ঠাকুরপাড়া গ্রামে। ফেসবুকে ইসলাম ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে কয়েকদিন ধরেই এলাকায় প্রচার চালিয়ে মানুষকে উত্তেজিত করা হচ্ছিল। প্রশাসন আগাম কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তার নাম টিটু রায়। ঠাকুরপাড়ায় বাড়ি হলেও তিনি নারায়ণগঞ্জে থাকেন, লেখাপড়া জানেন না। করিরাজি করেন। গ্রামে ঠাকুরপাড়ার বাড়িতে থাকেন তার মা জিতন বালা। টিটুর দুই মেয়ে, এক ছেলে। দুই মেয়ে স্কুলে লেখাপড়া করতো। তাদের অপহরণ করে ধর্মান্তরিত করা হয়। বড় মেয়েকে উদ্ধার করার পর এক হিন্দু ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছোট মেয়েকে এখনো উদ্ধার করা যায়নি। ছেলেটি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে, ঠাকুমার সঙ্গে থাকে। অভিযোগ করা হয়েছে, এই টিটু রায়ের মোবাইল থেকে ফেসবুকে ইসলাম ধর্মের অবমাননা করে ছবি দেওয়া হয়েছে। তবে

যে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে ছবিটি এসেছে সেখানে নাকি লেখা মোহাম্মদ টিটু রায়। সাধারণভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পরিকল্পিতভাবে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে এই ছবিটি পাঠানো হয়। উদ্দেশ্য অত্যন্ত পরিষ্কার, এই হিন্দু প্রধান এলাকায় একটি অস্থির পরিস্থিতি সৃষ্টি করে হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করা, যাতে তারা এই এলাকা ছেড়ে চলে যায়। তাহলে তাদের জায়গাজমি সহজেই দখল করা যাবে। এই ধরনের হামলা ও নির্যাতনের সব ঘটনার পেছনে রয়েছে একই কারণ।

আওয়ামি লিগের মন্ত্রীরা এখন টের পাচ্ছেন, এসব হামলা এক সূত্রে গাঁথা। দলের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক যোগাযোগ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের রংপুরে ঠাকুরপাড়া পরিদর্শনে গিয়ে বলেছেন, কক্সবাজারের রামু, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর এবং রংপুরের ঠাকুরপাড়ায় হিন্দুদের ওপর হামলা একই সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর কাজ। তিনি আরও বলেন, বন্ধুপ্রতিম দেশ ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সবচেয়ে ভালো। এই সুসম্পর্ক নষ্ট করার জন্যে স্বার্থান্বেষী মহল নানা ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। এর আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল রংপুরের ঠাকুরপাড়া পরিদর্শন করে এসে বলেছিলেন, ফেসবুকে উস্কানিমূলক ছবি দিয়ে পরিকল্পিতভাবে রংপুরে হিন্দু সমাজের ওপর হামলা হয়েছে। এই ঘটনাগুলো আমাদের কাছে প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে গভীর ষড়যন্ত্র। তিনি আরও বলেন, তদন্ত চলছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত সরকারিভাবে কিছু বলছি না। তবে আমরা মনে করছি এটা একটা ষড়যন্ত্র, সবকিছু আমরা টের পাচ্ছি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইঙ্গিত দেন, কক্সবাজারের রামু, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর-সহ বিভিন্ন স্থানে একইভাবে ধর্মীয় উস্কানি দিয়ে হামলা হয়েছিল। তাঁর মতে রংপুরের ঘটনায়ও ষড়যন্ত্র থাকতে পারে। তিনি সরাসরি বলেন, আমাদের কাছে খবর রয়েছে ওই ঘটনার সঙ্গে জামায়াত, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি রয়েছে। এর আগে রংপুরের এসপি মিজানুর রহমান সাংবাদিকদের বলেছিলেন, নির্বাচনের আগে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরির জন্যে জামায়াত শিবির এ ঘটনা ঘটিয়েছে। কিন্তু বিএনপি নেতারা বলছেন, সাম্প্রদায়িক ঘটনাগুলোর সঙ্গে তারা জড়িত নয়। বরঞ্চ আওয়ামি লিগই হিন্দুদের বাড়িঘর দখল করছে, আর দখলের লক্ষ্যেই এই হামলা চালানো হচ্ছে।

হিন্দু নেতারা এই ষড়যন্ত্রের কথা সত্তরের দশক থেকে বলে আসছেন। বিভিন্ন সময় তাদের ক্ষোভ ও প্রতিবাদের জবাবে বলা হয়েছে, এগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা। দুই মন্ত্রী এখন বাস্তবতা অনুধাবন করতে পেরেছেন বলে মনে হয়। উল্লেখযোগ্য, স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম দুর্গাপুজোয় হামলা হয় দেশের বিভিন্ন স্থানে। ১৯৭৫ সালে মুজিব হত্যার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের নির্মূল করার জন্যে নানা কৌশলের আশ্রয় নেওয়া হয়। পাকিস্তানি আমলে জারি করা শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিল করেন মুজিব, কিন্তু তাঁকে হত্যার পর এই আইন মহাপরাক্রমে পুনরুজ্জীবিত করা হয়।

হিন্দু সমাজের জমিজমা, বাড়িভিটা দখলের মহোৎসব শুরু হয়ে যায়। জিয়াউর রহমান শত্রু সম্পত্তি খুঁজে বের করার জন্যে পারিতোষিকের ব্যবস্থা করেন। আমলারা মাঠে নেমে পড়েন শত্রু সম্পত্তি খুঁজে বের করার জন্যে। পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সংবিধানের ইসলামিকরণ হয়। যার ধারাবাহিকতায় ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করে অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামি রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ভিত্তি কায়েম হয়। ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা পরিণত হন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে। সাম্প্রদায়িক হামলা, প্রতিমা ভাঙচুর, নির্যাতন-নিপীড়ন, অপহরণ করে ধর্মান্তর, জায়গাজমি দখল এবং দেশত্যাগে বাধ্য করার ঘটনা নিয়মিত ও স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়। ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা ভোট দিলেও মার খায়, ভোট না দিলেও মার খায়। নির্বাচনের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেলে সংখ্যালঘুরা প্রমাদ গোনে। ২০০১ সালের নির্বাচনে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি সারাদেশে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তা ছিল নজিরবিহীন। ওই নির্বাচনের পর বাগেরহাটের এক হিন্দু মহিলা তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছে আর্জি জানিয়েছিলেন, যেন তিনি ভোটার তালিকা থেকে হিন্দুদের নাম বাদ দিয়ে দেন। হিন্দুরা ভোট দিতে চায় না, শুধু এদেশে থাকতে চায়। ওই হামলার পর শারদীয় দুর্গাপুজোর মহাসপ্তমীর দিন ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির থেকে মহিলারা একটি ব্যতিক্রমী নীরব প্রতিবাদ মিছিল বের করেছিলেন, সামনে ব্যানারে শুধু লেখা ছিল, 'মাগো তুমি ফিরে যাও, এ বাংলায় এস না। কতখানি ক্ষোভ এই প্রতিবাদের মধ্যে ভাষা পেয়েছিল, রাজনীতিকরা তা বুঝেছিলেন কিনা জানি না'। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের পর দিনাজপুরের কর্নাই গিয়ে আর্তনাদ শুনেছিলাম, 'আমরা ভোট দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি, আমরা আর ভোট দিতে চাই না'। তার আগে সাতক্ষীরার শ্যামনগর এবং দিনাজপুরের চিরিবন্দরে বলাইবাজার সংলগ্ন তিনটি গ্রাম সাম্প্রদায়িক রোষে ছারখার হয়ে যাওয়ার পর হামলার শিকার অসহায় মানুষগুলোর আর্তি শুনেছি, 'আমাগা সাহায্যের দরকার নেই। আমাগো দেশত্যাগের ব্যবস্থা করে দাও বাবুরা'। বলাইবাজারে একটি পুরনো কালী মন্দির সংলগ্ন জায়গায় মসজিদ স্থাপনের উদ্যোগের বিরোধিতা করেছিলেন মুসলমান-হিন্দু সবাই। নেতৃত্ব দিয়েছিলেন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের মুসলমান চেয়ারম্যান। কিন্তু তার জন্য মূল্য দিতে হয়েছে তিন গ্রামের সংখ্যালঘুদের। শ্যামনগরের ঘটনা খুব ছোট। আক্রান্তদের বাড়িতে গিয়ে যা শোনা গেছে তা অত্যন্ত তুচ্ছ ব্যাপার। অথচ ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে নারকীয় হামলা চালানো হলো।

ধর্ম অবমাননার অভিযোগ এনে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করে সবকিছু ধ্বংস করে দেওয়ার নতুন কৌশল দেখা যাচ্ছে ২০১২ সালে রামুর ঘটনার মধ্য দিয়ে। ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে একটা সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি তৈরির পর ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হয়ে যায়, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাউকে চিহ্নিত করে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ চাপিয়ে দেওয়া হয়, তিনি দোষী কি নির্দোষ তা যাচাই করার আগে তার বিচার হয়ে যায়। পাবনার সাঁথিয়ার সেই দশম শ্রেণীর ছেলেটি, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার

নাসিরনগরের রসরাজ দাস, সিলেটের জকিগঞ্জের রাকেশ রায়, রংপুরের টিটু রায়— রিমান্ডে যেতে হয়েছে তাদের। রামুর উত্তম বড়ুয়া পালিয়ে বেঁচে যান। কোনো হামলাকারীকে কিন্তু রিমান্ডে নেওয়া হয়নি। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছে, 'আমাদের বিচার ব্যবস্থা এমনই, যে-কোনো সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্ত থানায় গিয়ে নিরপরাধ কোনও অ-মুসলমান ব্যক্তির নামে মামলা করলে আইনশৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ তাকে আসামি বানিয়ে হাতকড়া পরিয়ে, কোমরে দড়ি বেধে নিয়ে গিয়ে গারদে ঢুকিয়ে দিতে পারে। গ্রেপ্তারে গড়িমসি করলে সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তরা ইসলামকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে তথাকথিত অভিযুক্তকে হত্যা করতে পারে, গোটা সম্প্রদায়ের বাড়িঘর, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, যাবতীয় সম্পদ, উপাসনাস্থল ধ্বংস করতে পারে, নির্বিচারে লুটতরাজ করতে পারে, নারীদের ধর্ষণ করতে পারে, হুমকি দিয়ে দেশছাড়াও করতে পারে। এত সব করার পর এই দুর্বৃত্তরা থানা, পুলিশ, প্রশাসন ও আদালতের নাকের ডগায় বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়ায়। তাদের কিছু হয় না।'

একটি চমকপ্রদ ঘটনার কথা উল্লেখ করতেই হয়। নির্মূল কমিটির সংবাদ সম্মেলনেও তা উল্লেখ করা হয়েছে। গত বছর বাগেরহাটের একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক অশোক কুমার ঘোষাল ক্লাসে ডারউইনের বিবর্তনবাদ পড়িয়েছিলেন। ধর্ম অবমাননার অভিযোগ এনে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। হিন্দু হওয়ার অপরাধে ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণপদ মহলিকেও গ্রেপ্তার করা হয়। ২৩ দিন পর জামিনে তাঁরা বেরিয়ে আসেন। পরে মামলা থেকে প্রধান শিক্ষককে অব্যাহতি দেওয়া হলেও অশোক ঘোষালের কারাদণ্ড ও জরিমানা হয়। প্রশ্ন উঠেছে, পাঠ্যবইয়ে থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে ডারউইনের বিবর্তনবাদ কি নিষিদ্ধ? যদি নিষিদ্ধ না হয়, এ শাস্তি কি বৈধ? শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা নিয়েছে কিনা জানা নেই। অবশ্য যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে পাঠ্যবই সাম্প্রদায়িকীকরণ হয়েছে, তার কোনও ভূমিকা আশা করাও অন্যায়।

নির্মূল কমিটি বলেছে, কমিটির পক্ষ থেকে দুই শিক্ষককে উচ্চতর আদালতে ন্যায়বিচারের জন্যে আপিল করতে বলা সত্ত্বেও চাকরি হারানো ও অধিকতর নির্যাতনের মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কায় তাঁরা

ঠাকুরপাড়ায় জিহাদি তাণ্ডব।

এ নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করতে সম্মত হননি। নির্মূল কমিটি আরও জানিয়েছে, ২০১৪ সালে নির্বাচনের সময় যশোরের মালোপাড়ার দুই ধর্ষিতা নারী আসামিদের হুমকির কারণে মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। নির্মূল কমিটি তাদের মামলার সব দায়িত্ব গ্রহণের কথা জানানোর পরও তারা সাহস করে এগোতে পারেননি। নারায়ণগঞ্জে এক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হিন্দু প্রধান শিক্ষককে বিদ্যালয় কমিটির চেয়ারম্যান স্থানীয় সাংসদ তার এক আত্মীয়াকে নিয়োগ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রধান শিক্ষক নিয়মবহির্ভূত ভাবে এই ধরনের নিয়োগে সম্মত হননি। কিছু দিনের মধ্যেই ইসলাম অবমাননার ভুয়া অভিযোগ তুলে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে স্থানীয় মানুষকে খেপিয়ে তোলা হয় এবং ওই সাংসদ সবার সামনে প্রধান শিক্ষককে কান ধরে ওঠবস করতে বাধ্য করেন। পরে জেলে পর্যন্ত পাঠানো হয়।

কত উদাহরণ দিতে হবে? বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ প্রতি মাসে সাম্প্রদায়িক হামলার পরিসংখ্যান তৈরি করে। সর্বশেষ গত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের সাত সপ্তাহের হিসেবে দেখা যাচ্ছে, হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন ১৯ জন, সহিংস হামলা ও শারীরিক নির্যাতনে আহত হয়েছেন ৪২ জন। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও শ্মশানের সম্পত্তি দখলের ঘটনা ঘটেছে ৯টি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৮ নারী ধর্ষিত হয়েছেন, যার মধ্যে তিনটি ক্ষেত্রে ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনা ঘটেছে। মন্দিরে হামলা ও প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে মানিকগঞ্জ, খুলনার পাইকগাছা, কুড়িগ্রাম, সাতক্ষীরা, মাগুরা, গাজিপুর, বরগুনা, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, চুয়াডাঙ্গা ও নেত্রকোনায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্বৃত্ত গ্রেপ্তারের খবর পাওয়া গেলেও শাস্তি হয়েছে এমন নজির নেই।

বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দ প্রতিটি সভা বা সমাবেশে দাবি জানান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন কমিশনের প্রতিবেদন বাস্তবায়নের। বর্তমান সরকারের আমলে সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে গঠিত শাহাবুদ্দিন কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, ২০০১ থেকে ২০০৬ সালে বিএনপি-জামায়াত সরকারের আমলে সাম্প্রদায়িক হামলা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রায় ১০ হাজার ঘটনা ঘটেছে। এই দশ হাজার ঘটনার ক্ষেত্রে শতকরা এক ভাগ অপরাধীরও বিচার হয়নি, শাস্তি হয়নি।

বিএনপি- জামায়াতের সরকারের আমলে পরিচালিত সাম্প্রদায়িক হামলার বিচার কেন আওয়ামি লিগ সরকারের আমলে হবে না এর আসল কারণ খুঁজে পাওয়া সত্যিই কঠিন। ■

সাধবপুরের সরস্বতীর ভগ্নমূর্তি।

পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা জাগ্রত হলেই বাংলাদেশের হিন্দুরা বাঁচবে

মোহিত রায়

সম্প্রতি পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টে পাকিস্তানের পঞ্জাবে অবস্থিত বিখ্যাত কটাসরাজ মন্দির সংলগ্ন সরোবর রক্ষা নিয়ে একটি মামলায় বিচারপতিরা জানতে পারলেন এই প্রাচীন শিব মন্দিরে শিবের মূর্তিটিই নেই। কথিত আছে যে দক্ষযজ্ঞে সতীর মৃত্যুতে শিবের অশ্রুজলে তৈরি হয়েছিল এই সরোবর। সেই সরোবর পাশের কারখানার বর্জ্য ও অযত্নের ফলে শুকিয়ে এসেছে। এই প্রসঙ্গে জানতে গিয়ে বিচারপতি সাকিব নিসার জানতে পারেন যে মন্দিরে শিব ও হনুমানের মূর্তি কোনোটাই নেই। এরপর আরও জানা যায় যে পাকিস্তানের অনেক মন্দিরেই আর দেবদেবীর মূর্তি বা বিগ্রহ নেই। আমরা সবাই জানি ইসলাম মূর্তিপূজার বিরোধী। শুধু বিরোধী নয় মূর্তি ভেঙে ফেলাটাও ইসলামের একটি পুণ্য কাজ। তালিবানরা হাজার বছরের পুরানো বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আফগানিস্তানের বামিয়ান বুদ্ধের বিশালাকায় স্থাপত্য ২০০১ সালে ডিনামাইট ফাটিয়ে ধ্বংস করে দেয়। সতি কথা বলতে কী তালিবানরা কোনো অন্যায় কাজ করেনি। কারণ এই পথ দেখিয়ে গেছেন ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মহম্মদ। মক্কায় তিনশতাধিক দেবদেবী-সহ অতি পবিত্র আরবের কাবা মন্দিরটি তিনি দখল করে নিয়ে সব মূর্তি ধ্বংস করেন ও মন্দিরটিকে ইসলামের মসজিদ বানিয়ে দেন। যে কথা হচ্ছিল, এখন পাকিস্তানে কিছু মন্দির আছে কিন্তু সেখানে অনেকগুলিতেই আর বিগ্রহ নেই। বাংলাদেশের হিন্দুদের

ঢাকায় দেবীমূর্তির মুখে কালি মাখানো হয়েছে।

অবস্থা এখন অনেকটাই সেরকম— সোয়া কোটির বেশি হিন্দু সেখানে আছেন কিন্তু সেই থাকায় প্রাণ নেই। একটা বড় অংশ কীভাবে ভারতে চলে আসা যায় তার সুযোগ ও পরিকল্পনায় থাকেন, বাকিরা ধরে নিয়েছেন তাদের জিম্মি হয়ে থাকাটাই ভবিতব্য।

বাংলাদেশে হিন্দুরা আছেন, তাঁদের মন্দির পূজা সবই আছে। কিন্তু তা সবই ইসলামি সমাজের মর্জির উপর নির্ভর। গত ৪০ বছরে পশ্চিমবঙ্গে একটি মসজিদও আক্রান্ত হয়নি, কিন্তু বাংলাদেশে হিন্দু মন্দির আক্রমণ একেবারে জলভাত। যেমন গত ২৫ মে ২০১৭ বাংলাদেশের জয়পুরহাটের শিব মন্দিরে ১৩টি মূর্তি ভাঙচুর করা হলো। এরকম চলতেই থাকে। বাংলাদেশে কয়েক হাজার ছোট-বড় দুর্গাপূজা হয়। সোয়া কোটি হিন্দু কয়েক হাজার দুর্গাপূজা করাটাই স্বাভাবিক। তেমনি স্বাভাবিক প্রতি বছর একেবারে নিয়ম করে বিভিন্ন জায়গায় মূর্তি ভাঙা। শুধু এবছর, ২০১৭-র কিছু ঘটনা—

২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৭— কুষ্টিয়া জেলার দুর্বাচারা গ্রামে দাসপাড়ার মন্দিরে দুর্গা প্রতিমা ভেঙে ফেলে আওয়ামি লিগের সানওয়ার মোল্লার দলবল।

গাজিপুরের দুর্গাপ্রতিমা ভাঙচুর।

১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৭— লালমনির হাটের মোগলহাট ইউনিয়নের ১৮টি মন্দিরের দুর্গাপূজা বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কারণ এখানকার সর্বজনীন দুর্গামন্দিরের জমি দখল করে নেওয়া হয়েছে।

১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৭— বরগুনার পাথরঘাটা পৌরশহরের রাধাগোবিন্দ মন্দিরের দুর্গামণ্ডপের সর্বজনীন পূজার প্রতিমা রাতের অন্ধকারে জেহাদিরা ভেঙে দেয়।

৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৭— সাতক্ষীরায় আশাশুনিতে কচুয়া দুর্গা মন্দিরের ৫টি মূর্তি ভাঙচুর করা হয়।

৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৭— মানিকগঞ্জের শোলাই বাঙ্গালা গ্রামের দুইটি মন্দিরের ১৫টি মূর্তি ভাঙচুর করা হয়।

৫ অক্টোবর, ২০১৭— ফরিদপুরের নগরকান্দা উপজেলায় মাঝিকান্দা গ্রামে কালী মন্দিরের মূর্তি ভাঙচুর করা হয়।

এই হচ্ছে বাংলাদেশে পূজার মাসের অবস্থা। হিন্দুরা ধর্মকর্ম করছেন, নিজেদের সংস্কৃতি নিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু সবসময়েই রয়েছেন এক সন্ত্রাসের আবহাওয়ায়। বাংলাদেশের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ আবুল বরকত তাঁর গবেষণা গ্রন্থে বলেছেন, ৩০ বছর পর বাংলাদেশে আর হিন্দুদের দেখাই পাওয়া যাবে না।

দিনাজপুরে একটি মন্দিরের কালীপ্রতিমা ভাঙা হয়েছে।

বাংলাদেশের হিন্দুদের এইসব ঘটনার প্রতিরোধ করার তেমন কোনো উপায় নেই। আমরা সংখ্যাগুরু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে বাদুড়িয়া, দেগঙ্গাতে কিছু করতে পারিনি সেখানে বাংলাদেশের ৮ শতাংশ হিন্দু সমাজ দারুণ কিছু করবেন তা ভাবা বাতুলতা। বাংলাদেশের হিন্দুদের অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সমাজ। বাংলাদেশের হিন্দুদের এই অবস্থা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মূল সংবাদমাধ্যম বা শিক্ষা জগতে কোনো আলোচনাই হয় না। ভারতে কোনো কোনায় মুসলমান সংক্রান্ত কিছু ঘটলে পশ্চিমবঙ্গের মূল সংবাদ মাধ্যম ঝাঁপিয়ে পড়ে কিন্তু পাশের বাংলাদেশ নিয়ে একেবারেই চুপ। চুপ আমাদের সব ধর্মীয় সংগঠন--- রামকৃষ্ণ মিশন, ইসকন, লোকনাথ মিশন, অনুকূল সৎসঙ্গ বা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ। এদের সবার শাখা আছে বাংলাদেশে এদের উপর আক্রমণও হয়, তবু এরা একেবারে নীরব থাকে। সুতরাং বাংলাদেশের হিন্দুদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে থাকাটাই ভবিতব্য। ধর্মীয় সংগঠনগুলির এই দায়িত্বহীনতার বিষয়টি বারবার জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে হবে।

আজকের পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আলোচনায় বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বাংলাদেশের হিন্দুদের মানবাধিকার, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অধিকার সুনিশ্চিত করবার দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দলকে নিতে হবে।

বাংলাদেশের প্রতিটি ঘটনা আমাদের রাজনৈতিক প্রচারে আনতে হবে। নইলে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ যে অনিশ্চিত হয়ে পড়বে সেই সত্যটিকেও জনসাধারণকে জানাতে হবে। এজন্য ভারত সরকার যাতে আরও সক্রিয় ভূমিকা নেয় তার জন্য প্রচেষ্টা নিতে হবে। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের জনতা জাগ্রত হলেই বাংলাদেশের হিন্দুরা বাঁচবে, নইলে নয়।

এই সময়

হলদি ছেড়ে ভোটে

বাংলায় যা গায়ে হলুদ, বাংলার বাইরে সেটাই হলদি। গুজরাটের প্রথম পর্যায়ের ভোটের

লাইনে দেখা গেছে এক মহিলাকে। তার মুখে, পোশাকে হলুদের ছোপ। নিজেই জানালেন, হলদির অনুষ্ঠান ছেড়ে ভোট দিতে এসেছেন। মহিলার নাম, ফেনি পারেখ।

মরণসাধ

চব্বিশ বছরের এক যুবক মোটর বাইকে বিপজ্জনক স্টান্ট দেখাতে গিয়ে ব্রাজিলে

গ্রেপ্তার হয়েছেন। ছবিতে দেখা গেছে তিনি প্রায় শুয়ে পড়ে বাইক চালাচ্ছিলেন। হ্যান্ডেল ধরা ছিল এক হাতে, পা শূন্যে। সুপারম্যান সিরিজের ছবিতে এই ধরনের স্টান্ট দেখা যায়।

বদহজম

চীনের হেনান প্রদেশের একটি গ্রামের মানুষ চেষ্টা করেও পাইথনটিকে বাঁচাতে পারলেন

না। পাইথনটি ৩৫ কেজি ওজনের একটি ছাগল খেয়েছিল। তার ফোলা পেটের ছবি ভাইরাল হয়েছে ফেসবুকে। ছাগলের ধারালো শিংয়ের আঘাতে পাইথনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাতেই তার মৃত্যু হয়েছে।

সমাবেশ -সমাচার

লেডি অ্যাডভোকেটস্ অয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের ভগিনী নিবেদিতার সার্ধশত জন্মজয়ন্তী উদযাপন

গত ৯ ডিসেম্বর কলকাতা মহাজাতিসদন সংলগ্ন প্রেক্ষাগৃহে 'লেডি অ্যাডভোকেটস্ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনে'র উদ্যোগে ভগিনী নিবেদিতার সাধর্শত জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। সকালে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির শুভ উদ্বোধন করেন মহামান্য কলকাতা উচ্চন্যায়ালয়ের বিচারপতি শ্রীমতী সমাপ্তি চ্যাটার্জী। ভারতমাতা, মা-সারদা ও

ভগিনী নিবেদিতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিবৃন্দ। বন্দে মাতরম্ ও রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশ করেন সংগঠনের অন্যান্য সদস্যা। অনুষ্ঠানে সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনাল কলকাতা বেঞ্চের চেয়ারম্যান বিচারপতি অশোক কুমার পট্টনায়ক, প্রবাদপ্রতিম আইনজীবী ও প্রাক্তন মন্ত্রী কাশীকান্ত মৈত্র ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ দক্ষিণবঙ্গের প্রান্ত কার্যবাহ বিখ্যাত প্রযুক্তিবিদ ড. জিষ্ণু বসু বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা তাঁদের বক্তব্যের মাধ্যমে ভগিনী নিবেদিতার আদর্শ ও জীবন দর্শনের বিষয়ে আলোকপাত করেন। বিদগ্ধ বক্তরা ভারতীয় সনাতনী আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ভগিনী নিবেদিতার কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে নিজেদের গঠন করার আবেদন রাখেন। কলকাতা উচ্চন্যায়ালয়ের ও বিভিন্ন জেলা আদালতের প্রায় শতাধিক আইনজীবী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীমতী ধীশ্বরী নাগ ও শ্রীমতী সুস্মিতা সাহা দত্ত।

ভারতীয় ইতিহাস সঙ্কলন সমিতির আলোচনা সভা

গত ১১ নভেম্বর সল্টলেকের মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইন্সটিটিউটে ভারতীয় ইতিহাস সঙ্কলন সমিতি আয়োজিত এক আলোচনা সভায় ভারতে পূর্বতন শাসকের চোখ দিয়ে ভারত ইতিহাসের যে Colonial Historiography চলে আসছে তার অভিমুখ বদল নিয়ে এক মনোজ্ঞ চর্চার মূল সুরটি বেঁধে দিলেন Director Centre for freedom struggle & diaspora studies (CFDS)- এর বিদগ্ধ অধ্যাপক কপিল কুমার। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার চেয়ারম্যান ড. সুমিত কুমার ঘোষ ও সংস্থার পরিচালক প্রবীণ অধ্যাপক বিনয় কুমার শ্রীবাস্তব। প্রধান বক্তা কপিল কুমার ভারত ইতিহাসের অসংখ্য বিকৃতির উদাহরণ তুলে ধরে বলেন বামপন্থী ইতিহাসকার রূপে পরিচিত ইরফান হাবিব ভারতে মধ্যযুগীয়

এই সময়

অবাক বিবাহ

বিবাহিত জীবনের শুরুটা মোটেই ভালো হলো না। বিবাহ মণ্ডপেই হাজির পুলিশ। বর নাকি

দাগি আসামি! সেদিন পুলিশের চোখে ধুলো দিতে পারলেও পরেরদিন ধরা পড়ে গেলেন। নতুন কনের অনুরোধ-উপরোধ পুলিশ শোনেনি। ঘটনাটি মালয়েশিয়ার।

খেলতে খেলতে

খেলতে খেলতে মিলিওনেয়ার; রেয়ানের কৃতিত্বকে এভাবেই বর্ণনা করা উচিত।

দু'বছরের রেয়ান নানাধরনের খেলনা নিয়ে নিজের মতামত লেখে ইউটিউবে। সেইসব লেখা এতই জনপ্রিয় যে রেয়ান এক বছরে এগারো লক্ষ ডলার রোজগার করে। ভার্চুয়াল জগতে রেয়ান এখন রীতিমতো স্টার।

পদ্মাবতী প্রসঙ্গে

সঞ্জয় লীলা বনসালির পদ্মাবতী নিয়ে মুখ খুললেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া। তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, রাজস্থানের মানুষ পদ্মাবতীর চরিত্র নিয়ে কোনওরকম অসভ্যতা বরদাস্ত করবেন না। তিনি বলেন, 'মানুষের আবেগকে আঘাত করে এমন সিনেমা বানিয়ে কী লাভ!'

সমাবেশ -সমাচার

ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ফার্সিতে লেখা উৎসগুলির ওপরই নির্ভর করে অসংলগ্ন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত একটি ট্রাডিশন তৈরি করেছেন। সংস্কৃত, পালি প্রভৃতি ভাষায় লেখা ঐতিহাসিক উপাদানগুলির তিনি কোনো মূল্যই দেননি। ড. কপিল বলেন এই ঐতিহাসিকদের অনেকে সংস্কৃত জানতেনই না অথচ তারা সরস্বতী নদীর ওপর কল্পকাহিনি তৈরি করেছেন। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মধ্যযুগীয় ভারত ইতিহাস চর্চার কোনো বিভাগ নেই কিন্তু ইসলামিক ইতিহাসের ওপর গবেষণার ব্যবস্থা রয়েছে। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে তিনি শ্রুতির ওপর মূল গুরুত্ব আরোপের প্রসঙ্গ তোলেন, কেননা পৃথিবীর সফল দেশের ইতিহাসের মূল উপাদানই হলো শ্রুতি। এদিনের চর্চায় শ্রোতাদের সঙ্গে সরাসরি মত বিনিময়ের সময় ড. কপিল বলেন এই ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষদের থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর আগে 'সর্বধর্ম সমভাবে'র দর্শন আচরিত হত। এই সূত্রে ইতিহাস গবেষণার সর্বোচ্চ সংস্থা আই সি এইচ আর সম্প্রতি স্বাধীনতাপূর্ব ভারতে মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে তথ্যচিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে যৌথভাবে সহযোগিতা করছে। অধ্যাপক ঘোষ এ প্রসঙ্গে উত্তরপূর্ব ভারতের মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামী নাগারানি, মিজোরামে রানি বৈথানী, কনকলতা বড়ুয়া ও অন্যান্য অবহেলিত ব্যক্তিত্বের ওপর তথ্যচিত্র নির্মিত হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়ার সঙ্গে তরুণ গবেষকদের এই কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েতের আলোচনা সভা

'শিশুর যখন দাঁত ওঠে তখন নানারকম শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। জিএসটি নিয়ে যাঁরা সমালোচনা করছেন তাঁরা ভুলে গেছেন বড় কোনো সংস্কারের সময় প্রথম প্রথম নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। পরে তা কেটে যায়। আসলে জিএসটি-র যারা সমালোচনা

করছেন তারা ছেঁদো কথা বলছেন'। গত ১৩ ডিসেম্বর কলকাতায় সুবর্ণ বণিক সমাজ হলে অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েতের এক আলোচনা সভায় এভাবেই কথাগুলি বললেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল তথাগত রায়। প্রদীপ প্রজ্বলন এবং ভারতমাতা ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে আলোচনা সভার উদ্বোধন করেন শ্রীরায়। আলোচনা সভার বিষয় ছিল— 'জিএসটি-র নামে গ্রাহকদের ঠকানো বন্ধ হোক'। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের অখিল ভারতীয় সহসচিব অমলেন্দু চট্টোপাধ্যায়। সভায় প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির আর্থিক বিষয়ক প্রবক্তা প্রখ্যাত সিএ গোপালকৃষ্ণ আগরওয়াল। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েতের সর্বভারতীয় কোষাধ্যক্ষ অরুণ খাণ্ডেলওয়াল। তিনি অত্যন্ত সরল ভাষায় কোনো

এই সময়

জোঁকের মুখে নুন

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে এম এল এ, এমপিদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার দ্রুত

নিষ্পত্তি করতে বারোটি বিশেষ আদালত গঠনের সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র। এগুলি হবে ফার্স্টট্র্যাক পর্যায়ের আদালত। এক বছরের মধ্যে আদালত কাজ শুরু করবে। খরচ হবে আট কোটি টাকা।

গ্রামে বিদ্যুৎ

স্বাধীনতার পর ৭০ বছর কেটে গেলেও হাজার-হাজার গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়নি। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায়

এসে উদ্যোগ নেন। এখনও পর্যন্ত ৫,৯৫, ৩৯২টি গ্রামে পৌঁছে গেছে বিদ্যুৎ। বাকি ২০৭২টি গ্রাম। এ হিসেব বারোটি রাজ্যের।

চল্লিশ কিমি, প্রতিদিন

সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নীতীন গড়করি জানিয়েছেন, আগামী বছর

সরকার প্রতিদিন ৪০ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করার লক্ষ্য স্থির করেছে। সড়ক নির্মাণে ভারত ইতিমধ্যেই রেকর্ড গড়েছে। আগামী বছর প্রতিদিন ৪০ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করে আমরা সেই রেকর্ড আরও উন্নত করতে চাই।

সমাবেশ -সমাচার

জিনিস কেনার সময় উপভোক্তাদের কী কী বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে তা সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেন। বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত সিএ চিরঞ্জীব দাস। তিনি সভায় বেশ কয়েকজনের প্রশ্নের উত্তর সহজভাবে ব্যাখ্যা করেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের সংযোজক ড. সমীর চট্টোপাধ্যায়। এদিন সভাগার শ্রোতৃমণ্ডীতে পরিপূর্ণ ছিল। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রদেশের সহ-সংযোজক অ্যাডভোকেট দেবু চৌধুরী।

ঝাড়গ্রামে শিশু সংস্কারকেন্দ্রের বার্ষিক ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা

গত ৩ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সেবা বিভাগের অন্তর্গত শিশু সংস্কারকেন্দ্রের বার্ষিক ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয় ঝাড়গ্রাম জেলার বেনাশূলিতে। সংস্কার কেন্দ্রের ২০০ ভাই-বোন বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করে। প্রান্ত সহ সেবা

প্রমুখ ধনঞ্জয় ঘোষ এবং খড়্গপুর আই আই টি-র অধ্যাপক কুমার তেওয়ারী উপস্থিত থেকে প্রতিযোগীদের উৎসাহিত করেন।

কোচবিহারে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির কার্যকর্ত্রী অভ্যাস বর্গ

কোচবিহারের সারদা নগর সারদা শিশু তীর্থে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির কার্যকর্ত্রী অভ্যাস বর্গ অনুষ্ঠিত হয় গত ৩০ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর। এই শিবিরে পূর্ণ সময়ের জন্য উপস্থিত ছিলেন সমিতির সর্বভারতীয় সঞ্চালিকা শ্রীমতী শান্তা আক্কা। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে ২৫ জন কার্যকর্ত্রী শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। উত্তরবঙ্গে বর্তমানে সমিতির ৬০টি শাখা চলছে। আগামী এক বছরে এই সংখ্যা ১০০টিতে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়।

একাত্তরের বাংলাদেশ : নরকের নগ্নরূপ

অতিথি কলম

হিরণ্ময় কার্লেকার

পাকিস্তানের হাত থেকে মুক্তির জন্য বাংলাদেশ যে বীভৎস অত্যাচারের মুখোমুখি হয়েছিল তা ভোলা যায় না। কিছু শুষ্ক পরিসংখ্যান এই নৃশংস অত্যাচারের পরিধি কত বিস্তৃত ছিল তা তুলে ধরতে পারে না।

রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভা ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে এই হত্যালীলায় যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছিলেন তাঁদের সম্মানে ও ভবিষ্যতে এই ধরনের হত্যালীলা রুখতে ৯ ডিসেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক দিবস' হিসাবে ঘোষণা করেছে, যা ভারতবাসীর কাছে বিশেষ তাৎপর্যের। ছেচল্লিশ বছর আগে ইতিহাসের অন্যতম নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল আমাদের প্রতিবেশী বাংলাদেশে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। ঢাকার বর্তমান পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৩০ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিলেন, ৫ লক্ষ মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়েছিল এবং ভারতে উদ্বাস্তু হয়ে পালিয়ে এসেছিলেন দশ লক্ষ লোক। এই তথ্য আতঙ্কের চোরস্রোত বইয়ে দিতে পারে ঠিকই; কিন্তু সেই হত্যালীলার মধ্যে কতটা বীভৎসতা লুকিয়ে ছিল, ধর্ষণের সঙ্গে মহিলাদের ওপর কীধরনের অমানবিক নির্যাতন হয়েছে, যাঁরা ঘর ছাড়তে বাধ্য হলেন তাঁদের কোন পরিস্থিতির মধ্যে ফেলা হয়েছিল যাতে তাঁরা পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি, শিকড় উপড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন— কোনো শুষ্ক পরিসংখ্যান কি এগুলির জবাব দিতে পারে?

যাঁরা সেই সময় রাস্তাঘাটে মৃত বিবস্ত্র মহিলাদের যৌনাঙ্গে অজস্র ক্ষতচিহ্ন এবং শিশুদের মৃতদেহ দেখেছেন বা এইরকম বীভৎস অত্যাচারের কাহিনি শুনেছেন— ভারতের উদ্বাস্তু শিবিরগুলিতে এমন বহু মানুষ ছিলেন যাঁরা সেদিনের অভিজ্ঞতা কোনোদিনই ভুলতে পারবেন না। আমার কথাই ধরুন, ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, পাকিস্তানি সেনা এবং তাদের দালালরা যতটা বর্বর হতে চেয়েছিল ততটাই হয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল। এ ব্যাপারে কেউ ভিন্নমত পোষণ করবেন বলে আমার মনে হয় না।

গত ২৫ ও ২৬ নভেম্বর ঢাকাতে 'হত্যালীলা-অত্যাচার ও মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১' শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্র আয়োজিত হয়। আয়োজক ছিল 'জেনোসাইড টরচার অ্যান্ড লিবারেশন ওয়্যার স্টাডিজ ১৯৭১, জেনোসাইড-টরচার আর্কাইভ ও মিউজিয়াম ট্রাস্ট'। এই আলোচনায় স্মরণ করা হয়েছিল যে তাদের মুক্তি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশকে কী বিপুল পরিমাণ নৃশংসতা ও অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল এবং একই সঙ্গে ওই আলোচনা চক্রে এও দেখা গিয়েছিল যে ১৯৭১-এর পর জন্মানো বিভিন্ন প্রজন্মের অধিকাংশ মানুষই পাকিস্তানিদের নৃশংস অত্যাচারের বিষয়ে অবহিত আছে এবং তারা এ বিষয়ে আরও জানতে ইচ্ছুক। এটা খুবই বিশেষভাবে লক্ষণীয় কারণ সেনাপ্রধান পরে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং এইচ এম এরশাদের সেনা-শাসনকালে চারটি লক্ষ্য পরিষ্কারভাবে রাখা হয়েছিল— যুদ্ধাপরাধীদের নিরাপত্তা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা, দেশের মুক্তিযুদ্ধের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে ধ্বংস করা, বাংলাদেশের ইসলামিকরণ ও তাকে পাকিস্তানের কাছাকাছি আনা।

বেগম খালেদা জিয়ার বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন ১৯৯১-১৯৯৬ এবং ২০০১-০৬ সালে গঠিত দু'টি সরকারেরও এই ধরনের লক্ষ্য ছিল। আলোচনা-চক্রের বিভিন্ন আলাপচারিতায় এও দেখা গিয়েছিল, যে শাহবাগ আন্দোলন রাস্তায় নেমে সফল হয়েছিল তা সেনাপ্রধানের বা তাদের হাতের পুতুল ছিল না আবার খালেদা জিয়া, যার স্বামীর নাম জিয়াউর রহমান তার দ্বারাও পরিচালিত হয়নি। বাংলাদেশ এসব ভুলে যায়নি। এর জন্য প্রাথমিক কৃতিত্ব সেই পুরুষ ও মহিলাদেরই প্রাপ্য যারা ভীতিপ্রদর্শন, কারাগারে বন্দি করে

> "শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে কয়েকজন জঘন্য যুদ্ধাপরাধীর বিচার ও তাদের শাস্তি দিতে সমর্থ হয়। এক সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় একটি দেশে মানবতা-বিরোধী অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল এবং পাকিস্তানিরা ছিল সেই অপরাধের সহযোগী ও তার সংঘটক।"

অত্যাচার ও হেনস্থা সত্ত্বেও নিরবচ্ছিন্নভাবে লড়াই চালিয়ে গিয়েছে বাংলাদেশের অগ্নিপরীক্ষার স্মৃতিতে এবং এজন্য নিজেদের দহন করতেও তারা পিছপা হয়নি।

শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পরেই বিষয়টি আবার বিবর্ণ হতে শুরু করেছিল। প্রথমে সেনাপ্রধান, পরে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সাংঘাতিকভাবে অবদমিত করবার চেষ্টা করেছিল মুক্তিযোদ্ধাদের। আওয়ামি লিগকে খোঁড়া করে দেওয়া হয়েছিল। লিগের গোটা নেতৃত্বকে ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর রাত্রে জেলের মধ্যে খুন করা হয়েছিল। যা কিছু সময়ের জন্য মুক্তি-পন্থী ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। আবার শোনা গেল জিয়াউর রহমান গোলাম আজাদকে, যে লোকটি ছিল সম্ভবত শত্রুপক্ষের জঘন্যতম সহযোগী, তাকে পাকিস্তান থেকে আনার ব্যবস্থা করছে। ১৯৭৮-এর জুলাইয়ে গোলাম বাংলাদেশে ফিরল। মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে সে পাকিস্তানে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল।

১৯৭৯ সালে এই ঘোরতর পরিস্থিতির বিরুদ্ধে একটি নাগরিক সমিতি গঠিত হয়। যুদ্ধাপরাধীদের দল জামাত-এ-ইসলামিদের মিটিং ও সমাবেশের প্রতিবাদে মুক্তিযোদ্ধারা সংসদ আন্দোলনে নামার কথা ঘোষণা করে। শহিদ রমির মা জাহানারা ইমাম, যিনি সর্বজনমান্য একজন মহিলাও বটে এবং শহিদদের অন্য আত্মীয়েরা এই আন্দোলনে শামিল হন। তাঁরা পাশে পান একদল বুদ্ধিজীবীকেও।

প্রতিবাদ আন্দোলন ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করে বহু প্রবন্ধ, বই ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। শাহরিয়র কবিরের যুগসন্ধিক্ষণের কাজ 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা : কে কোথায়', যুদ্ধাপরাধীদের বিস্তারিত বর্ণনা ও সক্রিয়তাকে ফুটিয়ে তুলেছিল নিপুণভাবে। ১৯৮৭ সালে এই বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় এবং তা নতুনভাবে একটি আন্দোলনের সূচনা করে। ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে এরশাদ-সরকার ইসলামকে ঘোষণা করায় এর বিরুদ্ধে একটি নাগরিক কমিটি গঠিত হয় এবং প্রতিবাদ-আন্দোলনও চলতে থাকে।

একইসঙ্গে জামাত-এ-ইসলামি বাংলাদেশের কাজকর্ম ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং ১৯৯১ সালের ২৮ ডিসেম্বর পূর্বোল্লিখিত গোলাম আজম, যে তখনও একজন পাক-নাগরিক, তাকে তাদের আমির' (প্রধান) হিসেবে ঘোষণা করে জামাত। এর ফলে জনরোষের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। ১৯৯২ সালের ১৯ জানুয়ারি সর্বজনমান্য ১০১ জন বাংলাদেশি নাগরিক গঠন করেন 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'। এর প্রথম ঘোষণাতেই বলা হয়েছিল যে তাঁরা একটি জন-আদালত গঠন করবেন এবং সরকার কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ না নিলে তাঁরাই যুদ্ধাপরাধী হিসাবে ও বাংলাদেশের সংবিধান অমান্য করবার জন্য আজমকে দোষী সাব্যস্ত করবেন। এই বিচারের জন্য আন্দোলনে উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া যায়। ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি— যা 'নির্মূল কমিটি' নামে ওই সময় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, এদের নেতারা সেই রাজনৈতিক দলগুলির কাছে সহযোগিতার দাবি জানায় যারা মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করে; যাতে করে জন আদালতকে বিপুলভাবে জনপ্রিয় করে তোলা যায়। আওয়ামি লিগ-সহ তেরোটি রাজনৈতিকদল এতে রাজি হয়। ১৯৯২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি' গঠিত হয়। এর আহ্বায়ক হন জাহানারা ইমাম।

খালেদা জিয়া সরকারের বৃহৎ মাপের অবদমন সত্ত্বেও, ঢাকার রাস্তা, রেল ও ব্যক্তিগত যানের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণও যার মধ্যে ছিল, ঢাকার সুরাবর্দি উদ্যানে ১৯৯২ সালের ২৬ মার্চ জন-আদালতের বিচারসভা বিপুল সাফল্য পায়। ৫ লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে গোলাম আজমকে যুদ্ধাপরাধী ঘোষণা করে তার মৃত্যুদণ্ডের সাজা ঘোষিত হয়। এই ঘটনা আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। আর পেছনে ফিরে তাকাবার উপায় ছিল না। রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও এবং ১৯৯৪ সালের ২৬ জুন জাহানারা ইমামের মৃত্যু ঘটলেও আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি হতেই থাকল।

বিরুদ্ধ নীতির অস্তিত্ব থাকলেও, নির্মূল কমিটির নেতারা— শাহরিয়র কবীর, মুনতাসির মামুন, কাজিমুকুল ও অন্যান্যরা লড়াই চালিয়ে যেতে লাগলেন, ঠিক যেভাবে প্রাক্তন সেনানায়ক যেমন লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) কোয়াজি সাজ্জাদ আলি জাহির, বীর প্রতীক, তাঁদের উদ্যোগ সে দেশের ক্রমবর্ধমান নাগরিক সমাজের মৌখিক সমর্থন পায়, যেমন মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠন সেক্টর কম্যান্ডার'স ফোরাম এঁদের পাশে দাঁড়ায়। ২০০৬ সালটি বাংলাদেশের পক্ষে খুবই তাৎপর্যের যে বছর নির্মূল কমিটি ও সেক্টর কম্যান্ডার'স ফোরাম যৌথভাবে সেদেশের বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক মিটিং-মিছিলের আয়োজন করে; যাদের দাবি ছিল জামাত-এ-ইসলামি, বাংলাদেশের মতো সংগঠন এবং এদের শাখা সংগঠন যেমন ইসলামি ছাত্র সঙ্ঘ (পরে ইসলামি ছাত্র শিবির), আল বদর ও আল শ্যাম, রাজাকার, শান্তি কমিটি ও মুজাহিদ বাহিনীর সদস্যদের বিচার, যারা কেবল পাকিস্তানের গুপ্তচর ও সমর্থক হিসাবেই কাজ করেনি, একই সঙ্গে ধর্ষক, গণহত্যাকারী ও অত্যাচারী রূপেও বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সামনে নিজেদের মেলে ধরেছিল।

মুক্তিযুদ্ধের ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক দর্শনের সমর্থক হিসাবে যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করেছেন, ওই ঘটনা তাঁদের দাবিকে নতুনভাবে স্বীকৃতি দেয়। ২০০৮ সালের সাধারণ নির্বাচনে শেখ হাসিনা দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর তা আরও সঙ্ঘবদ্ধ হয়। যা শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে কয়েকজন জঘন্য যুদ্ধাপরাধীর বিচার ও তাদের শাস্তি দিতে সমর্থ হয়। এক সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় একটি দেশে মানবতা-বিরোধী অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল এবং পাকিস্তানিরা ছিল সেই অপরাধের সহযোগী ও তার সংঘটক। বাকিটা সবই ইতিহাস।

(লেখক দ্য পাইওনিয়ার পত্রিকার কনসালট্যান্ট এডিটর ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক)

চিঠিপত্র

ঔরঙ্গজেব পিতৃহন্তারক হতে পারেন না

'স্বস্তিকা' পাক্ষিক পত্রিকাটিতে নানা বিষয়ে লেখা পাই। পড়তে ভালই লাগে। নানা বিষয় মানুষ জানতে পারে। সব বিষয়ে যে পাঠক একাত্ম হতে পারে এমন নয়। তেমনই ১৩ নভেম্বর সংখ্যায় সন্দীপ চক্রবর্তীর লেখা 'তাজমহলের উপেক্ষিত ইতিহাস' আর ড. প্রসিত রায়চৌধুরীর লেখা 'তাজমহল আসলে শিব মন্দির' লেখা দুটি আজকের পরিস্থিতিতে অত্যন্ত আপত্তিকর। দুই লেখকই অনেক যুক্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন ওখানে হিন্দুদের শিব মন্দির ছিল। এ ধরনের লেখায় উদ্বুদ্ধ হয়ে হাজারে হাজারে করসেবকরা হাজির হয়ে দাঙ্গা বাধাবে। সেটাই কি লেখকদের মন কি বাত? এমনিতে আমরা দেখেছি উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী তাজ করিডরের নামে এই অনিন্দ্য সুন্দর অমর সৃষ্টি ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। আজ আবার যোগী আদিত্যনাথ পর্যটন থেকে তাজমহল বাদ দিতে চান। দেশের ভাগ্য ভাল প্রধানমন্ত্রী এর যোগ্য জবাব দিয়েছেন। সামান্য জ্ঞান থাকলে এমন মুস্লিম বিরোধিতা করবে না। যদি না কোনো স্বার্থ থাকে। আমরা সাধারণ মানুষ এসব থেকে যা বুঝলাম, তাহলো যেন তেন প্রকারেন তাজমহল নিশ্চিহ্ন করা চাই-ই চাই। মুষ্টিমেয় কিছু হিন্দুর দৌলতে, ষড়যন্ত্রে ভারতের গর্ব তাজমহল ধ্বংস হতে চলেছে। এমনিতেই লক্ষ লক্ষ পর্যটক দেশি বিদেশিদের ভিড়ে পরিবেশ দুষণে তার ক্ষতি হয়ে চলে। পর্যটকের মধ্যেও ষড়যন্ত্রীরা আছে। ভারতের যত শিল্পকর্ম, তা লুপ্ত করাই উদ্দেশ্য। ধরে নিলাম শিব মন্দিরের দাবি অনুযায়ী প্রত্নতাত্ত্বিকরা খনন করলেন, দেখা গেল শিব মন্দির। এরপর দাবি উঠবে মসজিদ, জৈন মন্দির অথবা বুদ্ধ স্তূপের। এ ইতিহাসই তো আবাহমান কালের। বেদ উপনিষদ রামায়ণ মহাভারত সব খাঁটি? যা লেখা হয়েছিল সব অক্ষত? মনে রাখা উচিত শুভশক্তি যেমন আছে একই ভাবে আছে অশুভ শক্তি। সারা বিশ্ব জানে ভারত দেবভূমি, অতুল ঐশ্বর্যের দেশ। আজ ভারতবাসী দরিদ্র সীমার নীচে। পৃথিবীর অন্যতম ধনী দেশ হয়েও তার কী দুর্দশা। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ'। ভাস্কো-ডা-গামাকে তাঁর দেশের রাজা রানি বলেছিল, ওই দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক করলে, আমরাও ধনী হব। সেটাই হয়েছে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ বহুজাতিক ব্যবসার নামে ভারতমাতাকে শকুনের মতো ছিঁড়ে খাচ্ছে। দুঃখের ও লজ্জার বিষয় তাঁর সন্তানেরা তাঁকে মুক্ত করতে পারছে না। নান্দনিক সৌন্দর্যের দেশ ভারত। অজন্তা, ইলোরা, তাজমহল অংসখ্য শিল্পকর্ম দেখলেই বোঝা যায়। আমি তো শাহজাহানকে ধন্যবাদ দেব, এমন অনিন্দ্য সুন্দর শিল্পকর্ম দেশবাসীকে উপহার দিয়েছিলেন। যা বিশ্বেও সমাদৃত। মৃত্যুর হিমশীতল রূপ মানুষের কাছে আতঙ্কের। সেই মৃত্যুকেও যে দৃষ্টিনন্দন রূপ দেওয়া যায়, তা মানুষের কল্পনাতেও ছিল না। শাহজাহান সেই অসাধ্য সাধন করেছিলেন। তিনি একজন সুসাশক ছিলেন। তথ্যে পেয়েছি হিন্দু মুসলমান শিল্পীদের নাম খোদাই করা পাথর তাজমহল চত্বরে ছিল, যা ভেঙে ফেলানোর মৃত্যু দিবসে অগণিত মুসলমান অন্য ধর্মের মানুষজন ভিড় করেন। এতে প্রমাণ হয় তিনি একজন সুশাসক। 'বহুজনহিতায় বহুজন সুখায় চ', যে কারণেই চক্রান্ত করে বন্দি করা হয়েছিল, দায়ী ঔরঙ্গজেব নয়। ইতিহাসের হিটলারের মতই ঔরঙ্গজেবকে মুখোশ করা হয়েছিল। তিনি নীরবে জবাব দিয়ে গিয়েছেন। সারা জীবন নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্মাচরণ করেছেন। পরম ধার্মিক পরম সার্থক মানুষ কখনও পিতৃহন্তারক হতে পারে না। ভাবুন তো মিশরের পিরামিডের পাশে তাজমহল! দুটিই কবর স্থান, কী অনুভূতি জাগে মনে? একটি ভয়ঙ্কর সুন্দর, অন্যটি ওহ্ কি দেখলাম! এছাড়াও শাহজাহান পত্নী মমতাজ বেগম বিশেষ গুণসম্পন্ন নারী ছিলেন। তিনি দেশের নারীশিক্ষার উন্নতিতে উৎসাহী ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্রা সিকো হিন্দু ধর্ম নিয়ে গবেষণা করতেন। ঈশ্বর-আল্লা তার কাছে একই ছিল। সে কারণেই তিনি খুন হয়েছিলেন। পরিশেষে বলব এ ধরনের লেখায় হিন্দু ধর্মের মহানুভবতা প্রকাশ পায় না, বিপরীত উদ্দেশ্য আছে বলে সন্দেহ জাগে। অপশক্তিকে সুযোগ করে দেওয়াই মনে হয়।

—মণিকা মুখার্জী,
যাদবপুর।

ওদের মাইনে বাড়ছে, আমাদের সুদ কমছে

ওদের বলতে, যারা রাজ্যের ও দেশের জনগণের জন্য, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'নন্দলাল' চরিত্রের ব্যক্তির মতো জীবনযাপন করে সেবা করে যাচ্ছেন সেইসব বিধায়ক, মন্ত্রী, সাংসদ। এদের বছরে বছরে আর্থিক দুরবস্থার জন্য যেভাবে জ্যামিতিক হারে মাইনে বেড়ে চলেছে তাতে করে আমাদের দেওয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের টাকা একদিন শেষ হয়ে যাবে। তখন হয়তো কাল্পনিক চরিত্র কুবেরের ভাণ্ডারে হাত পড়তে পারে।

প্রথমে দেখা যাক ওইসব নন্দলাল চরিত্রের জনসেবকদের দৈনন্দিন, মাসিক ও বাৎসরিক খরচ। ওনাদের নেকনজরে পড়ার জন্য জনগণের দেওয়া উপঢৌকনে উপবাস ভঙ্গটা মনে হয় হয়ে যায়। আর প্রায়ই সভাসমিতি থাকে তাতে করে দ্বিপ্রাহরিক আহারটা মনে হয় এমনই হয় যে নৈশভোজের আর প্রয়োজন পড়ে না।

তাহলে খাওয়াটা মোটামুটি ফ্রি হলো। এবার থাকা। ওটা সরকারি বিলাসবহুল আবাসনে মাগ্না থাকা। সকলের যোগাযোগের জন্য টেলিফোন ব্যবস্থা ফ্রি, আর মোবাইলের কথাটা না বলাই ভালো। কোন কোম্পানি কোন মন্ত্রীকে একটি স্পর্শকাতর পরদাওলা মোবাইল দেবে তার

জন্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় ওনাদের নেক নজরে পড়ার জন্য। কারণ এই সব ব্যক্তি দুর্নীতিপরায়ণ ও দু'নম্বরি ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত। আর ওইসব করতে হলে তো আইনের খপ্পরে পড়ার ভয় থাকে তাই ওনাদের তো তোষামোদ করতেই হবে। সিন্ডিকেটরাজের যুগে এটা হওয়াই স্বাভাবিক।

ঘরের বাইরে গেলে শরৎচন্দ্রের নতুনদা চরিত্রের ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নন্দলাল চরিত্রের ব্যক্তিগণ তো হেঁটে বা সাইকেলে যাবেন না। তাই তাদের জন্য সরকারি খরচে চার চাকার ব্যবস্থা সোফার-সহ। এয়ার ইন্ডিয়ার মহারাজার ন্যায় গাড়ির দরজা খুলে ওই জনপ্রতিনিধি ভিতরে ঢুকে সরকারি পয়সায় দামি তোয়ালে দেওয়া সিটে আরাম করে বসে জনসেবা করতে বেরিয়ে পড়লেন। তাহলে গাড়ির খরচটা সরকারি অর্থাৎ আমাদের মতো বোকা জনগণের দেওয়া করের টাকায় মিটল। আবার ওনাদের স্ত্রীরা ওই গাড়ি করে বাজার করতে, ছেলে মেয়ের বিয়ের জিনিস কিনতে যায়। আউটরাম ঘাটে গিয়ে হাওয়া খেতে সরকারি পেট্রল পোড়ন। হাজার হলেও মন্ত্রীর বৌতো। রেল ভ্রমণের জন্য বার্ষিক কুপন পেয়ে থাকেন জনপ্রতিনিধিগণ। সুতরাং রেল ভ্রমণের জন্যও কোনো খরচ নেই।

কোনোস্থানে স্থলপথে বন্যা হলে চট্‌জলদি যেতে হলে তো যাওয়া যাবে না, তাই প্রকৃষ্ট যানবাহন বলতে বিমান। তাই সরকারি খরচে ওনারা বন্যাদুর্গতেদের দেখতে যান তারা কীভাবে কষ্টে দিন কাটাচ্ছে।

এরপর আসা যাক তাঁদের চিকিৎসার কথায়। হাজার হলেও তো ওনারা জনসেবা করতে প্রাণপাত করে চলেছেন, তাই ওনাদের তো জনগণের মতো রক্তমাংসের শরীর, শরীর খারাপ হতেই পারে। তার জন্য বড় বড় নার্সিংহোম। তাতেও না হলে বাঙ্গালোর কিংবা তামিলনাড়ুতে চিকিৎসা করাতে সেই দুর্মূল্য সাদা পেট্রল পুড়িয়ে বিমানে করে চিকিৎসা কেন্দ্রে হাজির হন। এবং যতদিন না তিনি শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে সুস্থ হন ততদিনই সরকারি অর্থের অপব্যয় করে চিকিৎসিত হবেন। সদ্যপ্রয়াত প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সির মতো আর কোনো জ্বলন্ত উদাহরণ মনে পড়ছে না। এটা গেল ডাক্তারি খরচ। একজন নির্বাচিত সরকারি কর্মচারীর তাহলে ভাতা বাড়াবার প্রয়োজন কোথায়? আর যা পাওনা হিসেবে পাওয়া যায় তা জনসাধারণের সামনে প্রকাশ্যে বললে দুর্মুখ বলে বিবেচিত হওয়ার জন্য চুপ করে থাকাই শ্রেয় বলে মনে করি।

এইসব নির্বাচিত সরকারি প্রতিনিধিদের যদি যাতায়াত, থাকা খাওয়া গাড়ি, রেল, বিমান চাপার জন্য, ডাক্তারির জন্য কোনো খরচ না হয় তবে ওনাদের মাইনে কখনও একগুণ কখনও দুগুণ বাড়িয়ে অর্থের অপচয় করা হচ্ছে কেন?

যারা সরকারি অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী তাদের যারা এম আই এস করেছে এবং সেই সুদের পয়সায় যাদের সংসার চলে তাদের মহার্ঘ ভাতা যেটা তাদের প্রাপ্য সেটা দেওয়ার ব্যাপারে সরকারের কোনো হেলদোল নেই কেন?

এই নন্দলাল ও নতুনদা চরিত্রের বিধায়ক ও সাংসদদের আর্থিক সুবিধা দেওয়ার থেকে পেনশন ভোগীদের কথাটা বিবেচনার সঙ্গে চিন্তা করলে মনে হয় পক্ষপাতদুষ্ট এই অপবাদ থেকে মুক্ত হতে পারবে।

—**দেবপ্রসাদ সরকার,**
মেমারী।

ভারত কি ধর্মনিরপেক্ষ?

'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটা সংবিধানে যুক্ত হয়েছে ভারত স্বাধীন হবার অনেক পর। কেন যুক্ত হয়েছে, কী স্বার্থে যুক্ত হয়েছে, কার কী অভিসন্ধি ছিল সেসব আলোচনা এখন নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যুক্ত যখন হলোই তখন তখন তাকে মান্যতা দেওয়া প্রয়োজন। অথচ আমরা দেখি ধর্মনিরপেক্ষতার দায় বর্তায় এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর, একটু স্পষ্ট করে বললে হিন্দুদের উপরে। সংখ্যালঘুরা যদি হিন্দুদের মন্দির ভেঙে তাহলে সেটা অধিকার, হিন্দুরা এর প্রতিবাদ করতে গেলে সে সাম্প্রদায়িক। দুর্গাপুজোর বিসর্জনের দিন মহরম পড়লে প্রতিমা নিরঞ্জন করা যাবে না— হিন্দুদের শাস্ত্রবিধি বিসর্জন দিয়ে মহরমের রাস্তা ছেড়ে দিতে হবে। না মানলেই সে সাম্প্রদায়িক। মনে হয় স্বাধীনতা দিবসের দিন মহরম পড়লে হয়তো ঘোষণা হবে স্বাধীনতা দিবসটা একদিন পিছিয়ে দাও।

কে কী খাবে, কে কী পড়বে—এই নবনীতির উদ্ভাবকের অমৃতবচন হলো— হিন্দুরা গোমাংস খাও এবং খাওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করো, কিন্তু মুসলমানদের যেন কখনও শুয়োরের মাংস খেতে বোলো না। তাহলে ধর্মনিরপেক্ষতা থাকবে না, হবে সাম্প্রদায়িক। আসলে ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার দায় শুধু হিন্দুদের। তাই তো প্রকাশ্য জনবহুল রাস্তায় গলা জড়িয়ে হিন্দু-মুসলমান 'একই বৃন্তে দুটি কুসুম' সেজে গোমাংস ভক্ষণ করে, কিন্তু শুয়োরের মাংস থাকলে দেখা যেত ওই বৃন্ত থেকে কখন একটা কুসুম খসে গেছে তা টেরই পাওয়া যায়নি।

ভারত যদি সত্যিই গণতান্ত্রিক দেশ হয়ে, তাহলে আইনকানুনও তো এক হওয়া উচিত। কিন্তু ব্যতিক্রম সেই মুসলমানদের ক্ষেত্রে। 'তালাক, তালাক, তালাক' শুধু এই শব্দত্রয় তাদের আইন। সুপ্রিমকোর্ট কী রায় দিল তাতে তাদের কিছু এসে যায় না। আর মহান নেতারা তো উদ্বাহু নৃত্য করছে আর বলছে ঠিকই তো, আইন সবার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে কী চলে! আর প্রয়োগ যদি করতেই হয়, করো সহনশীল, সর্বংসহা হিন্দুদের উপর। তারা ঠিক মেনে নেবে। না মানলেই সে সাম্প্রদায়িক। তাই প্রশ্ন জাগে, ভারত কি সত্যিই ধর্মনিরপেক্ষ?

—**অভিজিৎ চৌধুরী,**
মন্তেশ্বর, পূর্ব বর্ধমান।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

সূর্য পুজোরই অন্য নাম ইতু

নন্দলাল ভট্টাচার্য

অষ্ট চাল অষ্ট দূর্বা কলসপত্রে থুয়ে
ইতুর কথা শুন সবে মন প্রাণ দিয়ে।

এমনি ভাবেই শুরু হয় ইতুর ব্রতকথা। কার্তিক সংক্রান্তি থেকে অগ্রহায়ণের সংক্রান্তি পর্যন্ত এক মাস প্রতি রবিবারে বাংলার ঘরে এই ভাবেই শুরু হয় ইতুর ব্রত। শুরু হয় পয়ারকথন। বর্তমানে গ্রামেগঞ্জে এই ব্রত পালনে পড়েছে কেমন যেন একটা ভাটার টান। অথচ কিছুদিন আগেও ইতু ছিল বাংলার অন্যতম লোক-ব্রত কথা। যেখানে ছিল নারীর স্বাধীনতা এবং অধিকার। বস্তুত ইতু এক অর্থে সম্পূর্ণ ভাবেই মেয়েলি ব্রত। পরবর্তীকালে পুরোহিত নিয়োগ করা হলেও হিন্দুর এই ব্রত পূজা অনুষ্ঠানে সবেসর্বা মেয়েরাই।

ইতু কী, কেন এই ব্রত বা পূজা তা নিয়ে আলোচনার আগে বরং শোনা যাক ইতুর গল্প। অর্থাৎ ব্রত-কাহিনি। ইতুর ব্রতকথা একসময় ছিল সম্পূর্ণ ভাবেই মৌখিক সাহিত্য। এখন অবশ্য তার লিখিত রূপও পাওয়া যায় বইয়ের আকারে। মৌখিক ও লিখিত রূপের মেলবন্ধনেই এবার ইতুর গল্পের বিস্তার।

গ্রামের এক বামুন। স্ত্রী আর দুই মেয়ে উমনো এবং ঝুমনোকে নিয়ে সংসার। বামুন বড়োই গরিব এবং মূর্খও। তবে প্রচণ্ড লোভী। লোভের কারণেই নিষ্ঠুর। মেয়েদের প্রতি নেই একটুকু ভালোবাসা। বরং আছে এক ধরনের নির্মমতা।

সেবার শরৎ-হেমন্ত পেরিয়ে এল শীত। বামুনের ইচ্ছে হলো পিঠে খাওয়ার। পিঠে তৈরির কোনও উপকরণই নেই ঘরে। নেই কেনার মতো অর্থও। বামুনের কিন্তু এক কথা, কোথা থেকে কী হবে জানি না, ইচ্ছে যখন হয়েছে তখন খাবই। যেমন করে হোক তা তৈরি করতে হবে বউকে।

বেচারা ব্রাহ্মণী! কী আর করে! লোকের বাড়ি থেকে চেয়েচিন্তে জোগাড় করে পিঠের উপকরণ।

এবার লোভী বামুন বউকে বলে, দেখো, সব পিঠে আমি একা খাব। তুমিও পাবে না, মেয়েদেরও দেবে না। অন্যথা হলে কুরুক্ষেত্র হবে।

বেচারি বউ জানে তার স্বামীকে। তাই মেয়েরা ঘুমিয়ে পড়লে পিঠে করতে বসে। ওদিকে বামুন বসে একটা দড়ি নিয়ে। গুণতে তো জানে না, তাই পিঠে গড়ার ছ্যাক ছ্যাক শব্দ শুনে দড়িতে একটা করে গিঁট দেয়।

পিঠের গন্ধে আর শব্দে উঠে পড়ে উমনো-ঝুমনো। বায়না ধরে পিঠে খাওয়ার। মা আর কী করেন, দুই মেয়েকে দেন একটা করে। পিঠে নিয়ে চলে যায় মেয়েরা।

বামুন খেতে বসে গিঁট বাঁধা দড়ি নিয়ে। খেতে খেতে দেখে যা পিঠে হয়েছে তার চেয়ে দুটো কম। শুরু করে চিৎকার। বলে কোথায় গেল আমার পিঠে।

বামনি বলে, মেয়েদের দিয়েছি।

শুনে তো বামুন রেগে টং। মনে মনে বলে, রসো, দেখাচ্ছি মজা সকালে।

পরদিন সকালে দুই মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে বামুন, কাকার বাড়ি নিয়ে যাওয়ার নাম করে। জঙ্গলের মধ্যে চলতে চলতে ক্লান্ত দুই মেয়ে এক গাছের তলায় বিশ্রাম নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। এই সুযোগই খুঁজছিল বামুন। তাড়াতাড়ি ঝোলা থেকে আলতার শিশি খুলে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। তারপর ঘুমন্ত মেয়ে দুটিকে ফেলে রেখে চলে যায়।

বহুক্ষণ বাদে ঘুম ভাঙে উমনো-ঝুমনোর। দেখে বাবা নেই। চারদিকে ছড়ানো ছেটানো আলতাকে রক্ত ভেবে কাঁদতে থাকে উমনো। ভাবে বাবাকে বুঝি বাঘে খেয়েছে। ঝুমনো কিন্তু সবকিছু ভালো করে দেখে বলে, না-রে দিদি, এটা রক্ত নয় আলতা। বাবা আমাদের ফেলে রেখে চলে গেছে। গভীর জঙ্গলে পথ না-চেনা উমনো ঝুমনো দিশেহারা হয়ে চলতে থাকে নিজেদের গাঁয়ের খোঁজে।

এদিকে সূর্য বসছে পাটে। আঁধার ঘনিয়ে আসে। অন্ধকার জঙ্গলে চলা তখন বিপদকে ডেকে আনা। তাই কী করবে ভাবনায় পড়ে দুজনে। সামনেই বিরাট এক পুরনো বট গাছ। তার সামনে দাঁড়িয়ে দুজনে কাঁদতে থাকে, পুণ্যবতী মায়ের যদি আমরা পুণ্যবতী মেয়ে হয়ে থাকি, তাহলে হে গাছ, তুমি দু'ভাগ হয়ে যাও। আমাদের আশ্রয় দাও।

অবাক কাণ্ড। গাছ হলো দু'ভাগ। উমনো ঝুমনো তার মধ্যে যেতেই গাছ আবার যে কে সেই। পরদিন ভোরে গাছ থেকে বেরিয়ে

পথ চলা শুরু দুই বোনের। এক জায়গায় দেখে, পুকুরের ধারে বেশ কিছু মহিলা কী যেন করছে। কৌতূহলী দুই বোন তাদের মধ্যে এক বুড়িকে জিজ্ঞেস করে, এখানে কী হচ্ছে?

বুড়ি বলে ইতু পুজো। এ পুজো করলে 'ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ' হয়। বিপদ দূর হয়। দুঃখ কেটে সুখ হয়।

উমনো ঝুমনো তখন ইতু পুজো ও ব্রত করতে চায়। বুড়ি বলে, বেশ তো, কর তোমরা। কার্তিকের সংক্রান্তি থেকে অগ্রাণের সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতি রবিবারে এই ব্রত রাখতে হয়। নিরামিষ খেয়ে ব্রত পালন করতে হয়। আর পুজো শেষে একবারে অঘ্রাণের সংক্রান্তিতে ভাসান দিতে হয় ইতুর ঘট ও পাত্র।

বুড়ির কথামতো দুই বোন থাকে বুড়ির ঘরে। করে ব্রত পালন। একদিন পুকুরে গিয়ে তারা পায় এক তাল সোনা। তা নিয়ে ইতুর ঘট বানায় দুই বোন।

তুষ্ট ইতু এবার স্বপ্নে ভয় দেখায় বামুনকে। বলে অমুক জায়গায় রয়েছে তোমার মেয়েরা। এক্ষুনি নিয়ে এসো তাদের নাহলে রক্তবমি করে মরবে তুমি।

ভয় পেয়ে বামুন সকালে উঠেই বুড়ির ঘর থেকে নিয়ে আসে মেয়েদের। উমনো ঝুমনোর পুণ্যের ফলে দুঃখ দূর হয় বামুনের। দিন কাটতে থাকে সুখে।

এরই মধে একদিন মৃগয়ায় বেরিয়ে ক্লান্ত রাজা আর তার মন্ত্রী ওই বামুনের ঘরেই জল চায় তৃষ্ণা মেটাতে। জল দেয় উমনো ঝুমনো। তাদের দেখে মুগ্ধ রাজা। বলেন, তিনি বিয়ে করবেন উমনোকে আর ঝুমনোর বিয়ে হবে মন্ত্রীর সঙ্গে। বিয়ে হয়।

রাজা আর মন্ত্রী নতুন বউ নিয়ে ফিরতে থাকেন। ঝুমনো যাওয়ার সময় সঙ্গে নেয় ইতুর ঘট। কিন্তু রানি হওয়ার আনন্দে উমনো বেমালুম ভুলে যায় সব। ফলে শুরু হয় তার দুর্দশা।

যাওয়ার সময় উমনোর পথের দিকে নানা অশুভ ঘটনা ঘটতে থাকে। ঝুমনোর থেকে একবারে অন্যরকম। রাজধানীতে এসে নতুন বর-বউ ঢুকতে যাবে, হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে ফটক। রাজার মা বউকে সোনা দিয়ে বরণ করতে যান, তা হয়ে যায় রুপো। মন্ত্রীর মা-ও রুপো দিয়ে বরণ করেন ঝুমনোকে। কিন্তু সেই রুপো হয়ে যায় সোনা। ভয় পেয়ে মন্ত্রীকে বলেন রাজা, এ বউ অপয়া। একে নির্জন বনে নিয়ে গিয়ে কেটে ফেলো।

মন্ত্রী আর কী করেন। নিয়ে আসেন উমনোকে। দিদির দুঃখে কাতর, ঝুমনোর কথায় মন্ত্রী তাঁর বাড়িতেই লুকিয়ে রাখেন উমনোকে। ঝুমনো বলে, দিদি, ইতুর পুজো না করার জন্যই এটা হয়েছে। সামনের রোববার উপোস করিস। দুজনে রাখব ব্রত।

উমনো কিন্তু ব্রতর দিন খেয়ে ফেলে। ব্রত রাখা হয়নি। এই ভাবে তিন-তিনবার। শেষে ঝুমনো দিদির সঙ্গে একবারে লেগে থেকে পরের রবিবার তাকে নিয়ে ঠিক মতো পুজো করে। আর তাতেই কপাল খুলে যায় উমনোর।

ততদিনে রাজার মনে এসেছে অনুতাপ। মন্ত্রীকে বলেন, যেখান থেকে পারো উমনোকে ফিরিয়ে এনে দাও। মন্ত্রী আর কী করে। অনেক টালবাহানার পর নিয়ে আসে উমনোকে।

রাজা এবার খুশি। উমনোও ইতুর পুজো করতে ভোলে না। আর তাতেই রাজার তখন বাড়বাড়ন্ত।

মেয়েদের সুখের কথা শুনে বামুনও চলে আসে সেখানে। মেয়েদের কথামতো করে ইতুর পুজো। আর সেই পুণ্যে লাভ হয় বিদ্যা। হয় রাজার সভাপণ্ডিত।

এই যে ইতুর পুজো—এটা আসলে বৈদিক দেবতা সূর্যের পুজো। সূর্যের অন্য নাম মিত্র। মিত্র থেকে মিতু আর মিতুই অপভ্রংশে ইতু।

অনেকে মনে করেন এটা আসলে রবিশস্য দেবতার পুজো। পুজোর রীতিতে প্রথমে একটি সরাতে কচু, হলুদ, ধান, কলমি, হিংচে আর সুষনি গাছ পোঁতা হয়। চারদিকে ছড়ানো হয় পঞ্চকড়াই। সরার মাঝে রাখা হয় দুটি ঘট—যাতে থাকে পান সুপুরি। প্রতিদিন সরায় দেওয়া হয় জল। দানা শস্য থেকে হয় গাছ। অগ্রহায়ণের সংক্রান্তিতে ভাসান দেওয়া হয় ইতুর এই সরা।

বৈদিক-পৌরাণিক এবং লৌকিক ধারা মিলেমিশে এই ইতু। পুরুষরা সহযোগিতা করলেও—এ পুজো মেয়েদেরই। একই সঙ্গে শস্য উৎপাদন ও সমাজে নারীকে মর্যাদা দেওয়ার এ এক অন্যতম অনুষ্ঠান। ইতু মূলত রাঢ়বঙ্গ, উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের পুজো। পূর্ববঙ্গে ইতুর মতোই প্রচলিত ব্রতের নাম চুঙীর ব্রত। ■

বিবেকানন্দ সেবা ও শিক্ষা বিকাশ সঙ্ঘ পরিচালিত

স্বামী বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির (উচ্চ বিদ্যালয়)

(School Code-362 of D.S.E., WB)

সিউড়ী সরস্বতী শিশুমন্দির (প্রাথমিক বিদ্যালয়)

(Code No. 19080502302 of D.I.S.E.)

এবং

বিবেকানন্দ শিশুতীর্থ ছাত্রাবাস

(ছাত্রছাত্রী উভয়ের জন্য আলাদা ব্যবস্থা)

ভর্তির জন্য আবেদনপত্র ও প্রস্পেক্টাস সংগ্রহ করতে হবে।

এজন্য ১৫০ টাকা Demand Draff Birbhum Vevekananda Seva-O-Seksha Vekash Sangha এর নামে কেটে অথবা উক্ত সঙ্ঘের নামে Indian Bank, Swci Branch, A/c. No. 6138735800-তে Deposit করার পর এসএমএস করে নাম-ঠিকানা, ফোনে অথবা নীচের ঠিকানায় পত্র মারফত জানাবেন।

সম্পাদক, বীরভূম বিবেকানন্দ সেবা ও শিক্ষা বিকাশ শিশুমন্দির ভবন

বিবেকানন্দপল্লী, সিউড়ী, বীরভূম

Phone No. 9232685987/9091102646/9474614428

অবলুপ্তির পথে শিবাশ্রু হ্রদ কটাস

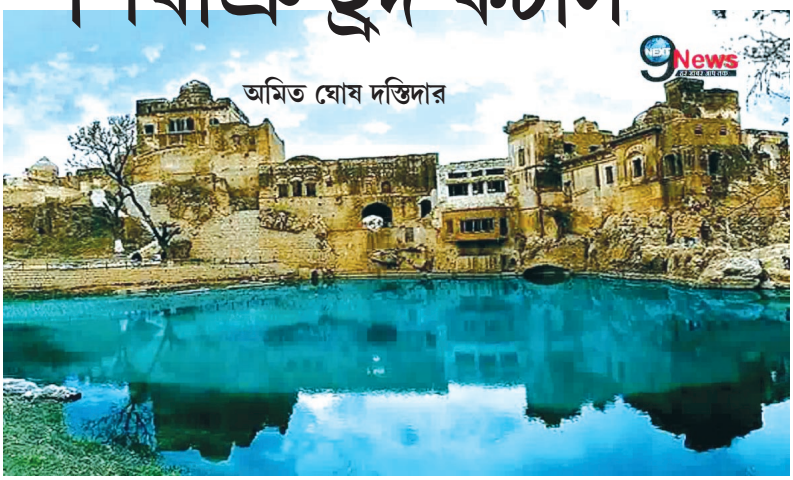

অমিত ঘোষ দস্তিদার

এক সময় হরি ও হরের সঙ্গে হলা ও হল নামে দুই দানবের ঘোরতর যুদ্ধ হলো। যুদ্ধে জয়লাভ করে হরি ও হরের মনে প্রচণ্ড অহঙ্কারের সৃষ্টি হয়। তাঁরা ভাবলেন তাঁদেরই অমিত পরাক্রমে দুষ্ট দুই দানব পরাজিত হয়েছে। হরি ও হর তাঁদের নিজ নিজ শক্তি লক্ষ্মী এবং গৌরীর কাছে নানাভাবে প্রকাশ করে অহঙ্কারের বশে লক্ষ্মী ও গৌরীকে কটু কথা শোনালেন। অভিমানী তাঁরা হরি ও হরকে ত্যাগ করে চলে গেলেন। শক্তি বিনা হরি ও হর তেজহীন হয়ে পড়লেন। তেজহীন হয়ে পড়ায় জগৎরক্ষার জন্য ব্রহ্মা তাঁর মানসপুত্র দক্ষ, মনু, সনকাদিকে তপস্যার মাধ্যমে শক্তিকে তুষ্ট করতে আদেশ দিলেন। ব্রহ্মার নির্দেশমতো মানসপুত্রেরা দেবীর আরাধনা করলেন। এঁদের মধ্যে দক্ষ দেবীকে কন্যারূপে কামনা করলেন। দেবীর কথামতো গৌরী দক্ষের ঘরে কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করলেন। নাম রাখা হলো সতী।

সতী দেবাদিদেব মহাদেবকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করেছেন, এমন কথা জেনে দক্ষ ব্রহ্মাকে সব কথা জানালেন। ব্রহ্মার অনুরোধে মহাদেব সতীকে বিবাহ করতে রাজি হলেন। শুভলগ্নে শিব-সতীর বিবাহ সুসম্পন্ন হলো। বিবাহের কিছুকাল পরে নৈমিষারণ্যে বিশ্বস্রষ্টাদের ব্যবস্থাপনায় এক বিরাট যজ্ঞের আয়োজন হলো। যজ্ঞস্থলে দক্ষের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে শিব ব্যতীত অন্য দেবতারা আসন ত্যাগ করে দক্ষকে সম্মান জানালেন। জামাতা মহাদেবের এরূপ আচরণে দক্ষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে অভিশাপ দিলেন— 'কোনও যজ্ঞের ভাগ গ্রহণের অধিকার থেকে শিব বঞ্চিত হবে।'

পরিস্থিতি খুব জটিল হয়ে উঠল। শিবহীন যজ্ঞ আয়োজনে দেবাতারা রাজি নন। দক্ষ শেষ পর্যন্ত নিজেই যজ্ঞের আয়োজন করলেন। মহাদেব বাদে সমস্ত দেবতা নিমন্ত্রিত। এই যজ্ঞের কথা সতীর কানে পৌঁছল। শিব তাঁকে কিছুতেই যজ্ঞে যেতে দেবেন না। স্বামীকে তাঁর দৈবীসত্তা দেখিয়ে যজ্ঞস্থলে যাওয়ার জন্য স্বামীর অনুমতি আদায় করলেন সতী।

দক্ষ যজ্ঞস্থলে সতীকে দেখে সকলের সামনে স্বামী শিব সম্পর্কে কটু ভাষণ দিতে লাগলেন। সতী বারবার পিতাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু দক্ষ কিছুতেই দমলেন না। স্বামী নিন্দা শুনে সতী দেহ ত্যাগ করলেন। শান্ত মহাদেব স্ত্রীর দেহত্যাগে প্রলয় রূপ ধারণ করেন। দক্ষের যজ্ঞস্থল লণ্ডভণ্ড হলো। মহাদেব সতীর নশ্বর দেহ তুলে নিলেন তাঁর কাঁধে। তারপর তাণ্ডবনৃত্যে উন্মাদপ্রায় মহাদেব পরিভ্রমণ শুরু করলেন। তাঁর তাণ্ডবে সৃষ্টি তখন ধ্বংসের মুখে। দেবতাদের অনুরোধে ভগবান বিষ্ণু তাঁর সুদর্শনচক্রে সতীদেহ টুকরো করতে লাগলেন। এক একটি টুকরো যেখানে যেখানে পড়েছে, সেই স্থান শক্তিপীঠ নামে জগতে খ্যাত হলো। ৫১ পীঠের সৃষ্টিতত্ত্বের পিছনে শিব ও শক্তির মিলনতত্ত্ব কাজ করেছিল।

সতীর মৃত্যুশোকে শিবের নেত্র থেকে যে অশ্রু নেমে এসেছিল তার থেকে দুটি হ্রদের সৃষ্টি হয়েছিল। একটি হলো রাজস্থানের 'পুষ্কর'। অন্যটি পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের চাকওয়াল জেলায়— 'কটাস'। 'কটাস' শব্দটি সংস্কৃত 'কটাক্ষ' শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। 'কটাস' শব্দটির অর্থ হলো অশ্রু।

পাকিস্তানের ইসলামাবাদ থেকে প্রায় ১১০ কিলোমিটার দূরে কটাসরাজ মন্দির। কটাসরাজ মন্দিরের সরোবরের জল (শিবাশ্রু) খুবই পবিত্র। পৌরাণিক মত অনুসারে কটাসরাজ মন্দির মহাভারত যুগের। মহাভারতের পাণ্ডবেরা তাঁদের অজ্ঞাতবাস জীবনের কিছু সময় এখানে কাটিয়েছিলেন। এখানে ৯০০ বছরের প্রাচীন কিছু মন্দির আছে। শিবাশ্রু-হ্রদ 'কটাস' এখন শুকিয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্ট পঞ্জাব সরকারের কড়া সমালোচনা করেছে। প্রাক্-ঐতিহাসিক কটাসরাজ মন্দিরের সরোবরের জল বর্তমানে কমে যাচ্ছে কেন সে বিষয়ে পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্ট প্রশ্ন তুলেছে। পঞ্জাব প্রদেশের প্রাদেশিক সরকার সরোবরের জল কমে যাওয়া নিয়ে বেশ কয়েকটি কারণ তুলে ধরে সুপ্রিম কোর্টে (পাকিস্তান) রিপোর্ট জমা দিয়েছে। সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, মন্দির চত্বরে সিমেন্ট ফ্যাক্টরির বর্জ্য থেকে ভূগর্ভস্থ জলস্তর ভরাট হচ্ছে। যার ফলে সরোবরের জল শুকিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও পর্যাপ্ত জল সরবরাহ ব্যবস্থা না থাকার কারণে আশেপাশের এলাকার প্রায় সকল ঘরবাড়ি কটাস হ্রদ থেকেই জল সংগ্রহ করে।

প্রায় হিন্দুশূন্য পাকিস্তানের কটাসরাজ মন্দির-সরোবর এলাকা সম্পূর্ণভাবে আজ হিন্দু শূন্য। কটাসরাজ মন্দির আজ পরিত্যক্ত। যদিও স্থানটি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের অন্তর্ভুক্ত। কাছাকাছি এলাকায় ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাওয়ার মতোই আরও কিছু হিন্দুমন্দির ও বৌদ্ধ মন্দির আছে। তবে সবগুলিরই করুণ দশা। ■

মা সারদার অপরূপ আত্মবিলয়

সুতপা বসাক ভড়

আমরা শ্রীমা সারদাদেবীর জীবনকাহিনি সম্বন্ধে পরিচিত। একজন রক্ষণশীলা হিন্দু রমণীর মতোই লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে তিনি জীবন অতিবাহিত করেছেন, কিন্তু তাঁর সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা সকলেই তাকে জননী বলে কায়মনোবাক্যে স্বীকার করেছিলেন। মিস ম্যাকলাউড, মিস ওলি বুল এবং ভগিনী নিবেদিতা সম্ভবত প্রথম ইউরোপীয়, যাঁরা শ্রীমার সাক্ষাৎ দর্শন করেন। এই তিনজনই ছিলেন বিদুষী, এবং ইউরোপ ও আমেরিকার বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব হিসেবে গণ্য হতেন।

১৮৯৯ সালের ৪ জানুয়ারি নেল হ্যামন্ডকে ভগিনী নিবেদিতা একটি পত্রে লেখেন : 'তাঁরা (ওলি বুল ও ম্যাকলাউড) শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণীর ফটো তোমাকে দেখাবেন। ইনি আমাদের 'নিজের মেয়ে' মনে করেন আর সদাসর্বদা আশীর্বাদ করেন। তাঁর ফটো কিন্তু সকলের মধ্যে বিতরণের জন্য নয়।'

এখানে শ্রীসারদা মা'র যে ছবিগুলির উল্লেখ নিবেদিতা করেছেন, তার মধ্যে একটি ঐতিহাসিক ফোটোগ্রাফ— যা বর্তমানে সর্বত্র পূজিত হয়। ইতিপূর্বে তাঁর কোনো ছবি তোলা হয়নি। শ্রীমতী ওলি বুল সর্বপ্রথম শ্রীমা'র ছবি তোলার ব্যবস্থা করেন, সেজন্য তাঁর ভূমিকাকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এই ফোটোগ্রাফটির সময় শ্রীমার বয়স পঁয়তাল্লিশ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অতি পরিচিত 'পূজিত' ছবিটিও তাঁর পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে তোলা।

'মায়ের কথা' ২য় খণ্ড থেকে জানতে পারি যে, শ্রীমা এই ফোটোগ্রাফটিকে 'ঠিক' বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ''সারা মেম (মিসেস ওলি বুল) এসে এইটি ওঠালে। আমি কিছুতেই দেব না। সে অনেক করে বললে, ''মা, আমি আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে পূজা করব।' তাই শেষে এই ছবি ওঠায়।''

এই বিষয়ে প্রবুদ্ধ ভারতের মার্চ, ১৯৬৫-তে প্রকাশিত সংখ্যায় স্বামী বিদ্যাত্মানন্দের (আমেরিকান সন্ন্যাসী; পূর্বাশ্রমে সাহিত্যিক ও সাংবাদিক জন ইয়েন) একটি প্রবন্ধের অংশবিশেষ উল্লেখযোগ্য :

''ঈশার উড তাঁর গ্রন্থে (রামকৃষ্ণ জীবনীতে) স্বাভাবিকভাবেই শ্রীমায়ের একটি ছবি দিতে চেয়েছেন। স্থির হয় যে ঠাকুরের ৪৫ বছর বয়সে দক্ষিণেশ্বরে তোলা 'পূজিত' ছবির সমজাতীয় মাতাঠাকুরাণীর একটি ছবি দেওয়া হবে। শ্রীমায়ের ওই ধরনের ছবির পরিচয় সন্ধানকালে কতকগুলি আকর্ষণীয় তথ্য পেলাম। এই ভঙ্গির ছবিটি কলকাতায় সিস্টার নিবেদিতার আবাসে ১৮৯৮-এর নভেম্বর মাসে অন্য দুটি ছবির সঙ্গে একই সময়ে একই অবস্থানে তোলা হয়। ঠাকুরের দেহান্তের ১২ বছর পরে শ্রীমায়ের এই ছবি তোলা হয় এবং এইটি তাঁর প্রথম ছবি। শ্রীমার প্রতিকৃতি আমেরিকায় নিয়ে যাবার ইচ্ছা করে মিসেস ওলিবুল ছবি তোলার ব্যবস্থা করেন। শোনা যায় যে, একজন ইংরেজ ফোটোগ্রাফারকে নিয়োগ করা হয়েছিল। পশুচর্মের আসন বিছিয়ে, সামনে কয়েকটি টব বসিয়ে দেওয়ার পরে শ্রীমা আসন গ্রহণ করেন। নিবেদিতা ও মিসেস বুল তাঁর শাড়ি ঠিকঠাক গুছিয়ে দিতে সাহায্য করেন। শ্রীমা ফোটোগ্রাফারের সামনে বসতে খুবই লজ্জাবোধ করেন, কিছুতেই ক্যামেরার দিকে তাকাতে চান না, নতদৃষ্টিতে বসে থাকেন এবং ভাবস্থ হয়ে পড়েন। এই পরিস্থিতিতে সন্তুষ্ট না হলেও ক্যামেরাম্যান প্রথম ছবিটি তোলেন, সেটি পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের 'নতদৃষ্টি চিত্র'। এরপর শ্রীমা সপ্রশ্ন আঁখি তোলেন— 'শেষ হয়েছে কি?' ফটোগ্রাফার তখন দ্বিতীয় ছবি তোলেন, সেইটিই সুপরিচিত 'পূজিত' ফটো।

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য লিখিত 'শ্রীশ্রীসারদাদেবী' গ্রন্থে পাওয়া যায় ওই ফোটোগ্রাফারের নাম হ্যারিংটন। ৩ মার্চ, ১৮৯৯ সালে নেল হ্যামন্ডকে লেখা অপর একটি পত্রে নিবেদিতা লিখেছেন : ''...অনুভূতিতে শ্রীমা অনবদ্য। জেনে রাখো, তাঁর ওই ফটো তোলার অর্থ এক্ষেত্রে তিনি জীবনে প্রথম নিজ পরিবারের বাইরে কোনো প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের দিকে সরাসরি তাকালেন বা তেমন কেউ তাঁর মুখ দেখলেন। তাই বলে এর জন্য কোনো আত্মসচেতনতা তাঁর ছিল না— এক বিন্দুও নয়। স্বামীজী এমনকী স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁকে তাঁর বিবাহের পরে (বিবাহকালে বয়স মাত্র পাঁচ!) অবগুণ্ঠনহীন দেখেননি।''

''...তাঁর মতো স্বামীকে পূজা করেছেন অথচ স্বামীকে মুখ দেখতে দেননি— এমন কাউকে ভাবতে পারো! মুখ দেখতে দিলে স্বামীর মনে বা চিন্তায় তিনি কখনো কখনো উদিত হবেন, এই লোভ তো থাকতে পারত! না, অপরূপ তাঁর আত্মবিলয়, ইনি তাও চাননি। ভাবতেও শিহরিত হয়ে উঠি!'' ■

পৌষমাসের কৃষিকর্ম

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

বোরধান : পৌষ মাস জুড়েই বোরোধান রোয়া চলবে। বোরোধানের উচ্চ ফলনশীল জাতগুলি হলো হেক্টরে চার থেকে সাড়ে চার টন ফলনদায়ী লম্বা-সরু চালের শতাব্দী, ক্ষিতীশ, ললাট; চার টন ফলনের মাঝারি-সরু চালের পারিজাত; ছয় থেকে সাড়ে ছয় টন ফলনের লম্বা-সরু চালের সংকর জাত যেমন কে. আর. এইচ-২, প্রো অ্যাগ্রো ৬২০১ ইত্যাদি। সংকর জাতের জীবনকাল ১২৫ থেকে ১৩৫ দিন, তবে উচ্চ ফলনশীল জাতের ক্ষেত্রে ১১০ থেকে ১২৫ দিন। শুকনো জমিতে দু'বার চাষ দিয়ে, কয়েকদিন পতিত রেখে, রোদ খাইয়ে, ছিপছিপে জলে, দু'তিন বার কাদা করে চাষ দিয়ে জমির আগাছা পচান দিয়ে, মই দিয়ে জমি তৈরি করে নিতে হবে। রোয়ার জন্য চার-পাঁচ পাতার এক মাসের চারা গুছিতে তিন-চারটি নিয়ে ৬ থেকে ৮ ইঞ্চি সারি দূরত্বে এবং ৬ ইঞ্চি চারা দূরত্বে বসাতে হবে। বাদামি শোষক পোকার আক্রমণ যেখানে বেশি সেখানে অন্তত বিশটি সারির পর এক সারি ফাঁক দেওয়া প্রয়োজন। রোয়া করার এক সপ্তাহের মধ্যেই চারার মৃত্যুর কারণে জমিতে ফাঁক হলে তা পূরণ করে নিতে হবে।

বোরো চাষে জমি তৈরির সময় প্রথমে একরে ১৫ থেকে ২০ কুইন্টাল জৈবসার এবং কাদা করা শেষ চাষের সময় ১২ কেজি নাইট্রোজেন, ২৪ কেজি করে ফসফেট ও পটাশ প্রয়োগ করতে হবে (এগুলি ইউরিয়া, সিঙ্গেল সুপার ফসফেট এবং মিউরিয়েট অব পটাশের পরিমাণ আনার জন্য মোটামুটিভাবে ২.২, ৬.১ এবং ১.৬ দিয়ে গুণ করে নিতে হবে)। সংকর জাতের জন্য এই মাত্রা হবে যথাক্রমে ১৫, ৩০ এবং ৩০ কেজি। জিঙ্কের অভাবজনিত এলাকায় মূলসারের সঙ্গে একর প্রতি ১০ কেজি জিঙ্ক সালফেট প্রয়োগ করা দরকার।

পৌষ মাসে তাপমাত্রা খুব নেমে যায়। এতে ধানচারার শারীরবৃত্তিয় কর্মে বিশেষ প্রভাব পড়ে, বৃদ্ধির হার কমে যায়; চারা তৈরির জন্য নির্ধারিত সময় তাই বেশি লাগে। এজন্য বোরোধানের বীজতলায় পরিচর্যার অঙ্গ হিসেবে বিকেলে জল ঢুকিয়ে, ভোরে বীজতলার দু'পাশে দাঁড়িয়ে দড়ি টেনে পাতার ডগায় জমে থাকা শিশির ফেলে দিয়ে সেই জল বের করে দিতে হবে। দেখা গেছে এতে সূর্যালোকে শারীরবৃত্তিয় কার্যের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়; বীজতলার চারাও তুলনামূলক তাড়াতাড়ি মূল জমিতে লাগানোর উপযোগী হয়ে ওঠে।

গম : সেচ সেবিত এলাকার জন্য অধিক নাবি জাতের গম বোনার সময় মিলবে পৌষের তৃতীয় সপ্তাহ। যদিও নাবিতে বুনলে গমের ফলন কমে যায়; দৈনিক ১৩ কেজি করে বা তারও বেশি ফলন কম হতে পারে।

অধিক নাবি জাতগুলি হচ্ছে ডি বি ডব্লুউ ১৪, এন ডব্লুউ ১০১৪, এইচ আই ১৫৬৩; যাদের হেক্টর প্রতি ফলন দেড় থেকে দু' হাজার কেজি, যেখানে সঠিক সময়ে (১২ থেকে ১৮ নভেম্বর) লাগিয়ে ফলন পাওয়া যায় তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার কেজি। এক্ষেত্রে জমিতে হেক্টর প্রতি ৪০ কেজি নাইট্রোজেন, ৬০ কেজি ফসফেট এবং ৪০ কেটি পটাশ দিতে হবে মূল সার হিসাবে। শোধনের জন্য প্রতি কেজি বীজে আড়াই গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মেশালে গোড়াপচা ধসা এবং ভূষা রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। হেক্টর প্রতি বীজ লাগবে সোওয়াশো কেজি; ১৮ সেমি সারি দূরত্বে এবং ৪-৫ সেমি গভীরতায় বীজ বুনতে হবে।

সঠিক সময়ে বোনা গমে এ মাসেই অধিক পাশকাঠি বের হয়, তাই বীজ বপনের ৪০ থেকে ৪২ দিনের মাথায় দ্বিতীয় দফায় সেচ দেওয়া সেচ দেওয়া দরকার। সেই সময় জমিতে দিতে হবে দ্বিতীয় দফার চাপান সার (হেক্টরে ৫০ কেটি নাইট্রোজেন); তার আগে জমির আগাছা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। নাবিতে বোনা গমে (১০-১৬ ডিসেম্বর বোনা গম) মুকুট শিকড় বের হবে এই মাসে, বীজ বেরোনোর ২০-২২ দিনের মাথায়। প্রথম সেচ তখন অবশ্যই প্রয়োজন হবে; করতে হবে আগাছা দমন এবং দিতে হবে প্রথম দফার চাপান সার (হেক্টরে ৪০ কেজি নাইট্রোজেন)।

আলু : পৌষের একেবারে প্রথমেই নাবি আলু বসানোর কাজ শেষ হয়ে যায়। মূল সার হিসাবে বিঘাতে ২৯ কেজি ইউরিয়া, ১২৫ কেজি ফসফেট আর ৩৩ কেজি পটাশ লাগে। জীবাণু সার পি এস বি এবং অ্যাজোটোব্যাক্টর তিনশো গ্রাম হারে দেওয়া ভাল। আলু লাগাতে বিঘা প্রতি আড়াই থেকে তিন কুইন্টাল বীজ দরকার হয়; এই বীজ ০.২৫ শতাংশ ম্যানেকোজের দ্রবণে কয়েক মিনিট ভিজিয়ে শোধন করে নিতে হবে। চাষ করা সমতল জমিতে ৬০ সেমি দূরত্বে নালা কেটে তাতে ২০ সেমি দূরত্বে নির্দিষ্ট গভীরতায় বীজ বুনতে হবে। বীজ আলুর চোখ নালার পাশে মুখ করে রাখলে তাতে বেশি কাণ্ড আর শিকড় বের হয়।

সঠিক সময়ে লাগানো আলুতে (কার্তিকের দ্বিতীয়ার্ধের শেষে) এ মাসের শুরুতে (বীজ লাগানোর ২৫-৩০ দিন পর) প্রথমবার এবং শেষার্ধে দ্বিতীয় বার (৪৫-৫০ দিন পরে) গাছের গোড়ার মাটি তুলে ভেলি করে দিতে হবে। প্রথম বার মাটি দেবার আগে বিঘায় ২৯ কেজি হারে ইউরিয়া চাপান দিতে হয়। প্রথম ভেলি তোলার পর সপ্তাহে

একবার এবং দ্বিতীয় ভেলি তোলার পর দশদিন অন্তর সেচের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

আলুতে পৌষ মাস থেকে জাবপোকার আক্রমণ দেখা দেয়। পৌষের শেষে আক্রমণের প্রবণতা বাড়ে। জাবপোকা কুটে রোগ ছড়ায়। অন্তর্বাহী কীটনাশক প্রয়োগে জাবপোকা দমন করা যায়। এই মাসেই আলুতে জলদি ও নাবি ধ্বসা রোগ লাগে। চারার বয়স ১৫-২০ সেমি হলেই ছত্রাক নাশক প্রয়োগ করতে হবে। জলদি ধসার জন্য তিনশো লিটার জলে এক কেজি ডায়থেন জেড-৭৮ এবং নাবি ধসার জন্য এক লিটার রিডোমিল গুলে এক একর আলুতে প্রয়োগ করতে হবে। আলুতে এই সময় (লাগানোর ৫০ দিন পর) কাটুই পোকা ও ঘুরঘুরে পোকার জন্য নজর দেওয়া প্রয়োজন। পোকা দমন করতে লিটার প্রতি দেড় মিমিল ক্লোরোপাইরিফস অথবা মিথাইল ডেমিটন বা মেটাসিসটক্স প্রয়োগ করতে হবে।

সরষে : পৌষ মাসে সরষের জাবপোকা ও ধসা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এসময় ঠাণ্ডার মাঝে সহসা গরম পড়লে এবং বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বাড়লে এই সমস্যা বাড়ে। প্রথমাবস্থায় জাবপোকা দমনের জন্য নিমঘটিত কীটনাশকে কাজ হলেও (অ্যাজাডিরেকটিন ১৫০০ পিপিএস প্রতি লিটার জলে ৩ মিলি অথবা অ্যাজাডিরেকটিন ১০,০০০ পিপিএম ১.৫ মিলি অথবা অ্যাজাডিরেকটিন ৫০,০০০ পিপিএম ১ মিলি গুলে স্প্রে করতে হবে) জাবপোকার মাত্রাতিরিক্ত আক্রমণের মোকাবিলায় ইমিডাক্লোপ্রিড ১৭.৮ এস এল প্রয়োগ করা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায় (প্রতি ১০ লিটারে ৩ মিলি)। সরষের ধসা রোগের জন্য প্রতি লিটার জলে আড়াই গ্রাম হারে ম্যানকোজের ৬৪ শতাংশ বা মেটাল্যাক্সিল ৮ শতাংশ স্প্রে করতে হবে।

ডালশস্য : সাধারণভাবে বিনা সেচে ডাল চাষ হলেও গাছের বৃদ্ধি ঠিকঠাক না হলে মুসুর, ছোলা, খেসারি, মটর ইত্যাদি ডালশস্যে এই মাসে ফুলের কুঁড়ি আসার সময় এবং দানা ধরার সময় হালকা সেচ দেওয়া উচিত। ডালের রোগ-পোকার জন্যও নজর রাখতে হবে।

ফলবাগিচা : পৌষের প্রথম সপ্তাহেও পেয়ারাতে ডাল বেঁকানো ও টানা দেওয়ার কাজ চলতে পারে, যার ফল পাকবে মে—জুন মাসে। এই সময় পেয়ারায় সাধারণভাবে ১০-১৫ দিন অন্তর সেচ দিতে হবে। এই মাস থেকেই কুলের ফল পাওয়ার শুরু।

এই মাসে পুরনো ও অনুৎপাদনশীল আম বাগানে ব্যাপক ছাঁটাই পর্ব শুরু করা যায়। গোড়া থেকে দু'-আড়াই মিটার উপরে এবং কাণ্ডের দু'-আড়াই মিটার বিস্তারে তিন-চারখানা প্রধান ডাল রেখে বাকি সব ডাল ছেঁটে দেওয়া হয়। কাটা অংশে অনতিবিলম্বে কপার ঘটিত ছত্রাকনাশকের লেই মাখিয়ে দিতে হবে।

সবজি : পুষ্টি বাগানের জন্য শীতকালীন সবজির মধ্যে টমেটো পৌষ মাসের প্রথমে তৃতীয় দফার জন্য লাগানো যায়। নবীন, নিধি ইত্যাদি ভাল জাত। চারা লাগাতে হবে ৯০ × ৬০ সেমি দূরত্বে। এছাড়া সম-বিন্যস্ত সংকর জাত ৯০ × ৭৫ সেমি এবং অসম-বিন্যস্ত সংকর জাত ৯০ × ৯০ অথবা ৯০ × ৭৫ সেমি দূরত্বে লাগাতে হবে। বীজের হার হবে হেক্টরে ৪০০-৫০০ গ্রাম, সংকর জাতে ১২৫-১৭৫ গ্রাম। লঙ্কা এই মাসে লাগানো যাবে। উচ্চ ফলনশীল জাতে হেক্টরে বীজ লাগবে ৫০০-৬০০ গ্রাম, সংকর জাতে ২৫০-৩০০ গ্রাম। বেঁটে ও মাঝারি জাতের দূরত্ব হবে ৪৫-৬০ × ৩০-৪৫ সেমি এবং সংকর জাতে ৭৫ × ৬০ সেমি।

শীতকালে চাষ করা যেসব গ্রীষ্মের সবজি আগে লাগানো যায়নি সেগুলি এ মাসে লাগানো যাবে। আর শীতকালীন সবজিতে জমির রস বুঝে এই সময়ি ১০-১৫ দিন অন্তর সেচ দিতে হবে। অল্প মূল্যের পলিথিনের ছাউনির মধ্যে অসময়ের ট্যাঁড়স (যেমন 'সগুন' জাত) লাগাতে হবে ৪০ × ২০ সেমি দূরত্বে।

পুষ্টি-বাগানে পৌষ মাসে ৬-৮ সপ্তাহ বয়সের ১২-১৫ সেমি লম্বা পেঁয়াজের চারা রুইতে পারা যায়। এমনকী চার-পাতাযুক্ত ৪-৬ সপ্তাহের বেগুন চারাও রোয়া যাবে।

সুন্দরবন অঞ্চলের জন্য আমন ধান তুলে মিষ্টি আলুর লতা বসানো যাবে। লতার দৈর্ঘ্য হবে ৮ ইঞ্চির ডগা বা ডগার নিচের অংশ। লতা ৬০ × ২০ সেমি দূরত্বে ২-৩ পর্ব মাটির নীচে রেখে লাগানো হয়। স্বাভাবিক সময়ে লাগানো মিষ্টি আলুর জন্য এই সময়ে চাপান সার দিয়ে (বিঘা প্রতি ৭.৫ কেজি ইউরিয়া) সারিতে মাটি তুলে দিতে হবে। ■

মকর সংক্রান্তি উৎসবের শুভক্ষণে
বনবাসী বন্ধুদের সাহায্যার্থে
বস্ত্র এবং অর্থ দিয়ে সাহায্য করুন।

তুমি-আমি এক রক্ত

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম

১৬১/১ এম জি রোড, রুম নং ৫১
বাঙ্গুর বিল্ডিং, সেকেন্ড ফ্লোর, কলকাতা-৭
ফোন : ২২৬৮০৯৬২, ২২৭৩৫৭৯২
E-mail : kalyanashram.kol@gmail.com

শোকসংবাদ

মালদা নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক নকুলচন্দ্র দাস গত ১৪ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স

হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র ও নাতি-নাতনি-সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধব রেখে গেছেন।

১৯৪৮ সালে বাল্যকালেই তিনি স্বয়ংসেবক হন। বাবা ডাঃ নিত্যগোপাল দাস ও ভাই সঙ্ঘের শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। নকুলদা যথাক্রমে মালদা নগরের পুড়াটুলি শাখার মুখ্যশিক্ষক, সায়ং বিভাগ কার্যবাহ ও নগর কার্যবাহের দায়িত্ব খুবই যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছেন। সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ অথবা সঙ্ঘের যে-কোনো শিবিরে ভোজন বিভাগের দায়িত্ব তাঁকে হাসিমুখে পালন করতে দেখা যেত। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি মালদা নগরের ললিতমোহন শ্যামমোহিনী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। প্রধান শিক্ষক হিসেবে ওই বিদ্যালয় থেকেই অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৬০ সালে তাঁর বাড়িতে শ্রীগুরুজীকে ওঠানো হয়েছিল। স্বয়ংসেবক, কার্যকর্তা ও প্রচারকদের অবাধ যাতায়াত তাঁর বাড়িতে। বার্ধক্যজনিত কারণে হাঁটার অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি শাখায় যেতেন। নকুলদার প্রয়াণে মালদা নগরে প্রবীণ স্বয়ংসেবকদের অধ্যায় সমাপ্ত হয়ে গেল।

* * *

বর্ধমানের প্রবীণ স্বয়ংসেবক ফণীভূষণ দে গত ২৯ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।

* * *

কলকাতা টালিগঞ্জ শাখার স্বয়ংসেবক উত্তম স্বর্ণকারের মাতৃদেবী নিভারানি স্বর্ণকার গত ৯ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। তিনি ২ পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতি- নাতনিদের রেখে গেছেন।

পরলোকে অলোকবরণ চট্টোপাধ্যায়

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বেহালা নগরের পূর্বতন সঙ্ঘচালক অলোকবরণ চট্টোপাধ্যায়ের ৭৫ বছরের জীবনের আকস্মিক পরিসমাপ্তি ঘটল গত ১৪ ডিসেম্বর ভোর সাড়ে ৫টায়। রেখে গেলেন স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, নাতনী, তিন ভাই এবং অসংখ্য গুণমুগ্ধ অনুরাগীকে।

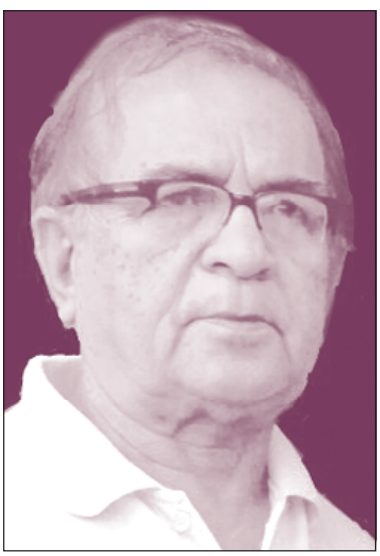

ছাত্র বয়সে ঢাকুরিয়ায় রণেনদার (রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়) হাত ধরে সঙ্ঘে প্রবেশের পর থেকে আমৃত্যু নিয়মিত শাখায় উপস্থিত হয়ে নিরবচ্ছিন্ন সঙ্ঘ সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। বেহালা নগরের সঙ্ঘকাজের ভিত্তি স্থাপনায় তিনি ছিলেন অন্যতম কারিগর। বৃহৎ উদ্বাস্তু পরিবারের ভরণপোষণের জন্য তাঁকে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে দেখা যেত। তাঁর হাত ধরেই বেহালায় সঙ্ঘ কাজের মাধ্যমে হিন্দুত্বের প্রচার ও প্রসার সম্ভব হয়। বেহালার অন্যতম সামাজিক- সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অগ্রণী। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের সভাপতির পথ অলঙ্কৃত করেন। ১৯৭৫-এ জরুরি অবস্থার সময় তাঁর দুই ভাই-সহ অন্য স্বয়ংসেবকরা যখন সত্যাগ্রহ করে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন, তখন তিনি তাদের অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর পুরো পরিবার সঙ্ঘ কাজে সমর্পিত। সঙ্ঘের শাখা থেকে শুরু করে বিভিন্ন দায়িত্ব সার্থকভাবে পালন করার পর প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির দক্ষিণ শহরতলি জেলার সাধারণ সম্পাদক পদে নিযুক্ত হয়ে একজন সৎ ও মূল্যবোধ সম্পন্ন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে পরিচিত হন। কর্মজীবনে ম্যাকফারলেন পেন্টস-এর উচ্চ পদস্থ অফিসারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেও সঙ্ঘ কাজে যথেষ্ট সময় দিতেন। বেহালা নগরের সঙ্ঘচালক থাকাকালীন বেহালার প্রতিটি শাখায় উপস্থিত থেকে স্বয়ংসেবকদের উৎসাহিত করতেন।

বয়স নির্বিশেষে বেহালার সমস্ত স্বয়ংসেবক তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে অনুপ্রাণিত হতেন। একজন আদর্শ স্বয়ংসেবকরূপে মরণোত্তর চক্ষুদান করে সেবার অন্যতম আদর্শ স্থাপন করে গেলেন। এছাড়াও পাড়ার ক্লাব 'বেহালা অভ্যুদয়'-এর সভাপতিরূপে সার্থকভাবে দায়িত্ব পালন করেন। সদালাপী, সদাহাস্যময়, ক্রোধবর্জিত, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী অলোকদা ছিলেন সবার অত্যন্ত প্রিয়। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে বেহালায় সঙ্ঘের অভূতপূর্ব ক্ষতি ও শূন্যতার সৃষ্টি হলো। ■

ভারতের বেসরকারি ট্রেন শকুন্তলা এক্সপ্রেস

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ভারতের মানুষ কালিদাসের শকুন্তলাকে চেনেন। কিন্তু কতজন শকুন্তলা এক্সপ্রেস নামের ট্রেনটির নাম শুনেছেন, সন্দেহ আছে। এরপর যদি বলা হয় ট্রেনটি চালায় শকুন্তলা রেলওয়েজ নামের একটি বেসরকারি সংস্থা, তাহলে বোধহয় অনেকে বিশ্বাসই করতে চাইবেন না। কিন্তু কথাটা অবিশ্বাস্য বলে মনে হলেও সত্যি। শকুন্তলা রেলওয়েজই ভারতের একমাত্র রেলপথ যা এখনও পর্যন্ত ভারত সরকারের অধীনস্থ নয়।

১৯৫২ সালে রেল জাতীয়করণ হওয়ার আগে সারা দেশে অনেকগুলি বেসরকারি রেলপথ চালু ছিল। যেমন পশ্চিমবঙ্গে মিটার গেজ ট্রেন চালাত মার্টিন অ্যান্ড বার্ন কোম্পানি। হাওড়া জেলার প্রবীণ নাগরিকদের মধ্যে অনেকেই হাওড়া-আমতা, আমতা-শিয়াখালা বা কাটোয়া-নবদ্বীপ লাইনের মার্টিন ট্রেনের নাম শুনে থাকবেন। রেলের জাতীয়করণ হবার পর এইসব ন্যারো গেজ লাইন বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু রহস্যজনক ভাবে বেঁচে যায় শকুন্তলা রেলওয়েজ। যার ফলে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ-ভারতে জন্ম নেওয়া ট্রেনটি এই বুলেট ট্রেনের ভারতেও রমরম করে চলছে। শকুন্তলা এক্সপ্রেসের যাত্রা শুরু মহারাষ্ট্রের অচলপুরে, শেষ ইয়াভাতমলে। দূরত্ব ১৯০ কিলোমিটার। ট্রেনের গতিবেগ ২০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায়।

শকুন্তলা এক্সপ্রেসের প্রতিষ্ঠা ১৯১০ সালে। প্রতিষ্ঠাতা ব্রিটিশ সংস্থা কিলিক অ্যান্ড নিক্সন। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সমান অংশীদারিত্বে বেসরকারি সংস্থাটি একটি নতুন কোম্পানি গঠন করে। সেন্ট্রাল প্রভিন্স রেলওয়ে কোম্পানি (সিপি আর সি)। লাইন পাতার কাজ করেছিল তারাই। উদ্দেশ্য ছিল বিদর্ভের তুলো ম্যাঞ্চেস্টারে পৌঁছে দেওয়া। ১৯১৬ সালে পণ্য পরিবহণ শুরু হলো। পাশাপাশি একই সময়ে শুরু হলো যাত্রী পরিবহণও।

ট্রেন চালানোর দায়িত্ব ছিল গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ের (জি আই পি আর) ওপর। মধ্য ভারতে জি আই পি আর-ই ট্রেন চালাত। স্বাধীনতার পরেও এই ব্যবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি। যদিও এখন সংস্থাটি ভারতীয় রেলের অধীনস্থ একটি সংস্থা। অন্যদিকে শকুন্তলা রেলওয়ের মালিক এখনও সি আর পি সি। আবার সি আর পি সি-র মালিক এখনও সেই কিলিক অ্যান্ড নিক্সনই। এর মধ্যে অবশ্য একটা পরিবর্তন হয়েছে। কিলিক অ্যান্ড নিক্সন এখন আর ব্রিটিশ নয়, ভারতীয় কোম্পানি।

১৯২১ সালে ম্যাঞ্চেস্টারে তৈরি একটি জেডডি স্টিম ইঞ্জিন দিয়ে শকুন্তলা এক্সপ্রেস চালানো শুরু হয়েছিল। সেটা ছিল ১৯২৩ সাল। ৭০ বছর ধরে ইঞ্জিনটি সার্ভিস দিয়েছে।

১৯৯৪ সালের এপ্রিলে ইঞ্জিনটি বাতিল করা হয়। তার জায়গায় আসে একটি ডিজেল ইঞ্জিন। শকুন্তলা এক্সপ্রেসের যাত্রীরা এখনও স্টিম ইঞ্জিনে টানা ট্রেনে চড়ার স্মৃতি রোমন্থন করেন। তখন হাত দেখালেই ট্রেন থেমে যেত। গ্রাম- গ্রামান্তরের গরিবগুর্বো মানুষ যে-কোনও জায়গা থেকে ট্রেনে উঠতে পারতেন।

এখানে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ট্রেনের যাত্রী মূলত গরিবরাই। ট্রেনের গার্ডই টিকিট বিক্রেতা। অনেকটা বাসের মতো। বেশিরভাগ স্টেশনেই কোনও কর্মী নেই। ভারতীয় রেলের অন্তর্গত বেশিরভাগ লাইনেই ব্রড গেজ ব্যবস্থা চালু হলেও শকুন্তলা রেলওয়েজ এখনও ন্যারো গেজ। আপ-ডাউন মিলিয়ে দু'বার যাত্রা। ১৯০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে শকুন্তলার কুড়ি ঘণ্টা সময় লাগে। যথেষ্টই বেশি, সন্দেহ নেই। কিন্তু শকুন্তলার অপরিহার্যতা তাতে বিন্দুমাত্র কমে না। স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, মুর্তাজপুর থেকে ইয়াভাতমল বাস সার্ভিস আছে। সময় অনেক কম লাগে। কিন্তু ভাড়া ১৫০ টাকা। ট্রেনের ভাড়ার ছ'গুণ। কতকটা সেই কারণেই ইয়াভাতমল মুর্তাজপুর অচলপুর অঞ্চলে যত গ্রাম আছে সেখানকার গরিব মানুষের কাছে শকুন্তলা শুধু ট্রেন নয়, লাইফলাইন। এত কম ভাড়ায় কে তাদের পৌঁছে দেবে! মানুষের প্রয়োজন এবং অপারগতাকে মেলাতে পেরেছে বলেই শকুন্তলা এক্সপ্রেস এখনও স্বমহিমায় উজ্জ্বল। কিন্তু একটা কথা তো স্বীকার করতেই হবে। শকুন্তলা রেলওয়েজের উন্নয়ন প্রয়োজন। মোদী সরকার সম্প্রতি উদ্যোগ নিয়েছে। ১৫০০ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। ন্যারো গেজ বদলিয়ে ব্রড গেজ করা হবে।

গরিব মানুষের মতো সরকারও চায় শকুন্তলা রেলওয়েজ আরও অনেকদিন টিকে থাকুক। হ্যাঁ, বেসরকারি হয়েই। ■

অতিমানব ফেডেরার-নাদাল

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিরকালীন প্রবাদবাক্যকে মিথ্যে প্রমাণিত করে বিশ্বের কাছে এক অমোঘ বার্তা বহন করে নিয়ে এসেছেন রজার ফেডেরার ও রাফায়েল নাদাল। বয়স বাড়লে শারীরিক সক্ষমতা কমতে থাকে, দেহ-মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না— এই সত্যটি গড়পড়তা সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু ফেডেরার এবং নাদাল সব অর্থেই অতিমানব। অতিমানবদের ক্ষেত্রে সর্বসম্মত নিয়মের ব্যতিক্রমই স্বতঃসিদ্ধ ঘটনা। তাইতো বিগত বছরে এই দুই 'সুপার জিনিয়াস' যেভাবে অতলান্ত খাদের কিনারা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে চারটি গ্রান্ডস্লাম ভাগাভাগি করে জিতে নিয়েছেন, তার তুলনা এ যুগে বিরল। নিকট অতীতে বক্সিংয়ে হেভিওয়েট বিশ্ব খেতাবধারী ভান্ডার হোলিফিল্ডই একমাত্র তুলনায় আসেন। নির্দ্বিধায় বলা চলে ২০১৭-র নায়ক এই দুই টেনিস তারকা যারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আদর্শ। এক দশক আগের কিংবদন্তী টেনিস তারকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পিট সাম্প্রাস যথার্থই বলেছেন— ফেডেরার হলেন প্রকৃতির এক অপূর্ব সৃষ্টি।

এই বছরে বড়সড় চমক দেখিয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। অতি সম্প্রতি পঞ্চম 'ব্যালন ডি আর' জিতে বিশ্বের সেরা ফুটবলারের স্বীকৃতি পেয়েছেন পর্তুগিজ তারকা। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসির পাশে বসাই শুধু নয়, দুনিয়ার সবকটি বড়মাপের ক্লাব টুর্নামেন্ট খেতাব স্প্যানিশ সুপার জায়ান্ট রিয়াল মাদ্রিদের ঘরে তুলতে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছেন রোনাল্ডো। গত বছর ইউরোপে সেরা করেছেন পর্তুগালকে। সামনের বছর বিশ্বকাপ। দুনিয়ার আপামর ফুটবলপ্রেমী দেখতে চান মস্কোর জগৎবিখ্যাত স্টেডিয়ামে ফিফা বিশ্বকাপ হাতে রোনাল্ডোকে। একই প্রত্যাশা করেন মেসির ভক্তরাও। আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ দেওয়া ছাড়া সব বড়মাপের টুর্নামেন্টে চাম্পিয়ন করেছেন মেসি। বার্সেলোনাকে জিতিয়েছেন ইউরোপীয়ান চাম্পিয়নস লিগ, বিশ্বক্লাব কাপ সব। বাকি শুধু ফিফা বিশ্বকাপ। এবছর বিশ্বক্রীড়াক্ষেত্রে এই চার মহাতারকা ছাড়া দলগত ভাবে চমকপ্রদ উত্থান দেখিয়েছে আর্জেন্টিনা হকি দল। সুপার পাওয়ার অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ড, জার্মানি, ইংল্যান্ডকে টপকে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে উঠে এসেছে ফুটবলে বিশ্ববন্দিত আর্জেন্টিনা।

আগামী কয়েকবছর বিশ্ব হকিতে রাজ করবে আর্জেন্টিনা। দুরন্ত গতি ফর্মূলা ওয়ান রেসিং কিংবদন্তীর পর্যায়ে উন্নীত ব্রিটিশ লুইস হ্যামিলটন এবছর সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট পেয়ে এক নম্বরে শেষ করেন। সব মিলিয়ে চারবার তিনি বিশ্ব চাম্পিয়ন হয়েছেন। অদূর ভবিষ্যতে সর্বকালীন সেরা র‍্যালিস্ট হয়ে ওঠার প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন তিনি।

দুনিয়া ছেড়ে এবার দৃষ্টি দেওয়া যাক ভারতের দিকে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এবছর ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন ব্যাডমিন্টনের দুই নক্ষত্র কিদাম্বি শ্রীকান্ত ও পিভি সিন্ধু। শ্রীকান্ত প্রথম ভারতীয় হিসেবে চারটি সুপার সিরিজ খেতাব জিতেছেন। বিশ্বের মাত্র পাঁচজনের এই অবিস্মরণীয় কীর্তি রয়েছে। প্রকাশ পাড়ুকোন, পুলেল্লা গোপীচাঁদের যোগ্য উত্তরসূরি শ্রীকান্ত ভবিষ্যতে অল ইংল্যান্ড ও বিশ্ব চাম্পিয়ানশিপ জিতে ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের ঐতিহ্য ও গরিমাকে আরো এগিয়ে দেবেন, এই স্বপ্ন দেখেন ভারতবাসী। পি ভি সিন্ধু বিশ্ব চাম্পিয়নশিপে রানার্স হয়েছেন এবছর। জিতেছেন কোরিয়া ও ইন্ডিয়ান ওপেন। ভাগ্য সহায় থাকলে আরো কয়েকটি সুপার সিরিজ জিততে পারতেন। এইচ এস প্রণয় ও সাইনা নেওয়ালও সাফল্য ব্যর্থতার যুগলবন্দির মধ্যে বছরটা অতিবাহিত করেছেন। আর ভাবিকালকে নির্ভরতা দিতে উঠে আসছেন লক্ষ্য সেন ও গোপীচাঁদ-কন্যা গায়ত্রী, যাঁরা ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক বৃত্তে ছাপ ফেলতে সক্ষম হয়েছেন।

জিতুরাই ও হেনা সিন্ধু শুটিংয়ে বেশ কিছু পদক জিতেছেন দেশে-বিদেশে। তাদের অবশ্য সবচেয়ে বড় সাফল্য শুটিং বিশ্বকাপে পোডিয়াম ফিনিস করা। গুয়াহাটিতে সম্প্রতি বিশ্ব যুব মহিলা বক্সিংয়ে কামাল করে দিয়েছেন হরিয়ানা ও অসমের বক্সাররা। জ্যোতিগুলিয়া, শশী চোপড়া, সাক্ষী চৌধুরি, অঙ্কুসিতা বড়োয়ারা প্রত্যেক ভারতীয় নারীর আদর্শ মেরিকমের সামনে সোনা জিতে যে স্বর্ণশোভিত যাত্রাপথের সূচনা করেছেন তা আরও মণি-মাণিক্যে ভরে উঠবে সামনের দিনগুলিতে এমনটাই আশা করা যায়। এখানেই থেমে থাকা নয়, সিনিয়র পর্যায়ে যথার্থ মূল্যায়ন হবে তাদের প্রতিভা ও ক্ষমতার। আর মেরিকম প্রতিদিনই নতুন করে ভাবতে শেখাচ্ছেন, স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। বয়স যত বাড়ছে ততই যেন প্রত্যয়ী হয়ে উঠছেন মেরি। এবছর তার পঞ্চম এশিয়ান খেতাব প্রাপ্তি যেন আরও একবার তার সত্যতা প্রমাণ করে। আর এক মহিলা শক্তিবীর মীরাবাঈ চানু বিশ্বভারোত্তোলন খেতাব জিতে কীর্তিময়ী কর্ণম মালেশ্বরীর পদাঙ্ক সার্থকভাবে অনুসরণ করে ভারতীয় নারীর মহিমাকীর্তন করেছেন বিদেশের মাটিতে। আর পঙ্কজ আদবানী যেন কিংবদন্তী, মিথ শব্দবন্ধগুলিকেই ক্লিশে করে দিয়েছেন। সব মিলিয়ে ১৮ নম্বর বিশ্ব খেতাব তাঁর করায়ত্ত, যা কিনা আন্তর্জাতিক যে-কোনো খেলার ক্ষেত্রেই এক দুর্লঙ্ঘ্য নজির। বিলিয়ার্ডস ও স্নুকারের আন্তর্জাতিক পরিসরে আদবানী যে গৌরবময় অধ্যায় রচনা করেছেন তা গোটা দুনিয়ার খেলা ও শরীরচর্চাকে দিকদর্শন করাবে উচ্চতর সত্যের প্রতি। ■

গাছেরাও ব্যথা-বেদনা অনুভব করে

গাছকে তো আমরা গাছই ভাবি। তার যে প্রাণ থাকতে পারে, তা আমাদের ভাবনার বাইরে। ব্যথা বেদনায় আমরাই তো কাঁদি। চার পেয়ে জন্তুদের কান্না পর্যন্ত আমরা মেনে নিয়েছি। কারণ কাঁদলে তাদের ডাকের সুর পালটে যায়। চোখ থেকে জলও তাদের পড়ে। কিন্তু গাছেদের ক্ষেত্রে

কেউ যদি বলে গাছেদের প্রাণ আছে, উত্তেজনায় তারাও সাড়া দেয়, তবে আমরা তাকে পাগল ছাড়া আর কিছু বলব না।

কিন্তু হ্যাঁ, ছোট্টবন্ধুরা, একজন বিজ্ঞানী তাঁর নাম জগদীশচন্দ্র বসু, তিনিই গবেষণা করে পৃথিবীর মানুষকে প্রথম শুনিয়েছিলেন গাছেদেরও প্রাণ আছে। উত্তেজনায় তারাও সাড়া দেয়।

বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু গাছেদের সেই ব্যথা-বেদনা অনুভবের কথাই সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীদের সামনে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন।

প্রথমে জগদীশচন্দ্রের গাছেদের প্রাণের কথা, ব্যথা-বেদনা অনুভবের কথা বিশ্বের বহু মানুষ স্বীকার করে নিতে চাননি। তখন অনেক বিজ্ঞানীই জগদীশচন্দ্র বসুকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলে উঠলেন, 'প্রমাণ করে দেখাও'।

জগদীশচন্দ্র তখন বিজ্ঞানীদের চ্যালেঞ্জ মেনে নিলেন। তিনি নানা যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। সেইসব যন্ত্রপাতির সাহায্যে বিজ্ঞানীদের সভায় চোখের সামনে তুলে ধরলেন গাছেদের প্রাণের কথা, ব্যথা-বেদনা অনুভবের কথা। যন্ত্রে ফুটে উঠল নানা সাংকেতিক ভাষা।

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে বসেছিল বিজ্ঞান কংগ্রেস, বিজ্ঞানীদের সভা। সেখানে পশ্চিম দুনিয়ার বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীরা হাজির হয়েছেন। তাঁরা দেখবেন বাঙালি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের এই নতুন আবিষ্কার।

বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র সমবেত বিজ্ঞানীদের সামনে একটি ব্যাঙকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে দিলেন। নিজের তৈরি যন্ত্রটি যুক্ত করলেন ব্যাঙটির দেহের সঙ্গে। দেখা গেল, প্লেটের উপর ব্যাঙটির বুকের যন্ত্রণার ভাষা ঢেউয়ের আকারে লেখা হয়ে যেতে লাগল। একটা টবে আনা হয়েছিল একটি লতা। আর জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর নিজের একটি যন্ত্র। নাম দিয়েছেন ক্লেরকোগ্রাফ। লতাটির সঙ্গে যোগ করে দিলেন সেই যন্ত্রটিকে। তারপর লতাটির দেহে প্রয়োগ করলেন বিষ। দেখা গেল, প্লেটের উপরেও লেখা হতে থাকল গাছটির মরণযন্ত্রণা।

এরপর তিনি ওষুধ প্রয়োগ করলেন ব্যাঙ আর লতাটির শরীরে। তারা ক্রমে সুস্থ হলো। সেই সুস্থতার লক্ষণও যন্ত্রের সাহায্যে লেখা হতে থাকল প্লেটের উপর। সে লেখা কোনও বর্ণমালায় নয়, যন্ত্রণার অব্যক্ত ভাষায়। প্যারিসের বিজ্ঞান কংগ্রেসে উপস্থিত বিজ্ঞানীদের জগদীশচন্দ্রের সেই প্রমাণ বুঝে নিতে অসুবিধা হলো না। একজন জাদুকরের মতো তিনি বিভিন্ন লক্ষণে এই প্রমাণগুলি দেখিয়ে সম্মোহিত করেছিলেন উপস্থিত বিজ্ঞানীদের। তাঁরা জগদীশচন্দ্রকে বললেন, 'প্রাচ্যের জাদুকর বিজ্ঞানী'। সারা পৃথিবী বিস্মিত হলো সেই নতুন আবিষ্কার সংবাদে।

আমরা খেলার ছলে গাছের পাতা ছিড়ি। অপ্রয়োজনে ওদের একটা ডাল কাটি, ছাল তুলে নিই, আঘাত করি। এমনকী গাছেদের গায়ে চাকু দিয়ে কেটে কেটে নাম খোদাই করি। মনে রেখো, এতে কিন্তু তারা খুবই কষ্ট পায়।

সংগৃহীত

ভারতের পথে পথে

বালুরঘাটের শ্রীশ্রী বোল্লা রক্ষাকালী মন্দির

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট থানার বোল্লাগ্রামে শ্রীশ্রীবোল্লা রক্ষাকালী মন্দির। কথিত আছে বোল্লাহাটে পান বিক্রেতারা ইংরেজ সরকারের রোষ থেকে মায়ের কৃপায় রক্ষা পায়। প্রতি বছর রাসপূর্ণিমার পরের শুক্রবার মায়ের পূজা শুরু হয় এবং সোমবার বিকেলে প্রতিমা নিরঞ্জন হয়। এই উপলক্ষ্যে ৩ দিন বিরাট মেলা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে কয়েক লক্ষ ভক্তের সমাগম হয়। এই কয়দিন মায়ের নামে এলাকা মুখরিত থাকে। পূজা দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তেরা আসে। মন্দিরের নাটমন্দিরে বসে কীর্তনের আসর।

জানো কি?

- ভারতের সবচেয়ে বড় জেলা গুজরাটের কচ্ছ।
- ভারতের সবচেয়ে ছোট জেলা পণ্ডিচেরীর মাহে।
- পশ্চিমবঙ্গে দার্জিলিং ছাড়া বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় পাহাড় রয়েছে।
- বাঁকুড়ায় শুশুনিয়া ও বিহারীনাথ প্রধান।
- পুরুলিয়ায় অযোধ্যা পাহাড় প্রধান।

ভালো কথা

কুকুরের দয়া-মায়া

আমাদের পাড়ার লালির এবার ৫টি বাচ্চা হয়। বাচ্চাগুলো যখন ১০ দিনের তখন লালি গাড়ি চাপা পড়ে মারা যায়। বাচ্চাগুলো মা-কে না পেয়ে খিদেয় সারাদিন কুঁই কুঁই করতে থাকে। সনুর ঠাকুমা বললো বাচ্চাগুলো মায়ের দুধ না পেলে মরে যাবে। পরদিন ছানাগুলোর চিৎকার শুনতে না পেয়ে ঠাকুমা বললো ওগুলো বোধহয় মরে গেছে। ঠাকুমার সঙ্গে আমরা কাছে গিয়ে দেখি ওপাড়ার কালি ছানাগুলোর মধ্যে শুয়ে আছে আর ছানাগুলো মনের আনন্দে কালির দুধ খাচ্ছে। ঠাকুমা বললো, দেখ, কুকুরের প্রাণেও কত দয়া-মায়া।

ঠাকুর বেসরা, সপ্তম শ্রেণী, কোটশিলা, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) দ গা হ য়ে	(১) ল স ন্ত রা মা
(২) মা র্ণি দো পূ	(২) ত জ্জা হা ব ড়

৪ ডিসেম্বরের সংখ্যার উত্তর
(১) পরশুরাম (২) পরাধীনতা

৪ ডিসেম্বরের সংখ্যার উত্তর
(১) সেনাবাহিনী (২) ভারতবর্ষ

উত্তরদাতার নাম

(১) শুভদীপ পাল, বসিরহাট, উঃ ২৪ পরগনা। (২) সৌরিশ কেশ, পার্বতীপুর, বর্ধমান। (৩) ঈশিতা জানা, বড়বাজার, বর্ধমান। (৪) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কলকাতা-৪৯।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা ।। অভিমন্যু ।। ৫

ইতিমধ্যে তেরো বছর কেটে গেল। নির্বাসনের শেষ বছর অজ্ঞাতবাসে পাণ্ডবেরা বিরাট রাজের রাজসভায় ছিলেন।

কৌরবরা আক্রমণ করলে অর্জুন এ সময়ে বিরাট রাজের পুত্র উত্তরকে জয়লাভে সাহায্য করেন।

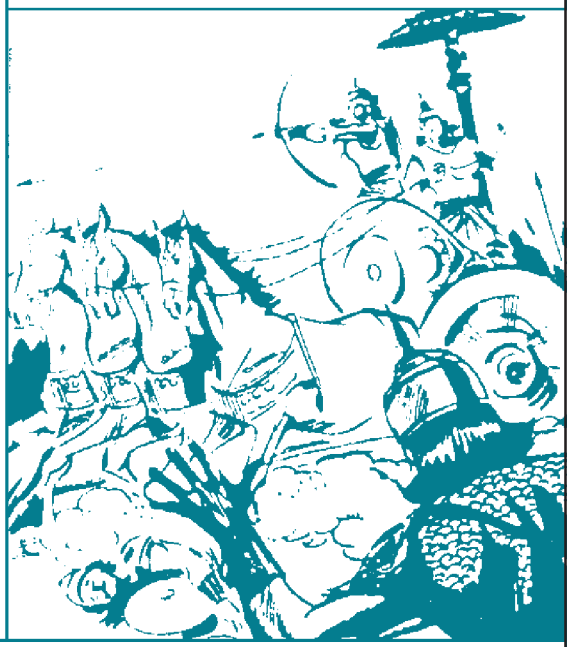

অর্জুন এবং উত্তর জয়ী হয়ে ফিরে এলে পাণ্ডবেরা বিরাট রাজের কাছে নিজ পরিচয় দেন।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18
25 December - 2017 - Rs. 10.00,

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. || দাম ১০ টাকা ||